BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

আশ্বিন বিদায় নেয়। কার্তিক আসে। রমনার ঘাসের ডগায় শিশির জমে ভোরবেলা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিরিষ গাছগুলোর শীর্ষে বসে থাকা গগনচিলের পাখায় শেষ শরতের আলো পড়ে। শিশির আর শিউলিপতনের শিরশির শব্দ শোনা যায় স্বামীবাগে, চামেলিবাগে। শিশির জমে ধোলাইখালের পাড়ে ঢোলকলমির ঝাড়ে, পল্টনের আল বিছানো পথের ধারে চোরকাঁটার ডগায়। শিশির টলমল করে ধানমণ্ডিতে সবুজ ধানের ডগায়। শান্তিনগর থেকে নবাবপুর রওনা হওয়ার আগে লোকে বিদায় নেয়, দোয়া করবেন, ঢাকা যাচ্ছি, পানা পুকুরের কচুরিপানার বেগুনি ফুলের পাপড়ি শিশিরের আর্দ্রতায় রোদের আদরে পথিককে মাথা নেড়ে বিদায় জানায়।

হাতি ঠেলা যায়, কার্তিক তো ঠেলা যায় না। বিশাল বাংলাকে ঢেকে দেয় যেন এক শকুনির পাখার ছায়া, তার নাম আকাল, তার নাম খাদ্যাভাব। সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে মঙ্গার করাল গ্রাস। দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে হা-অন্ন রব।

জিনিসপত্রের দাম বেশি, তার ওপর পাওয়াও যায় না, খাজা নাজিম উদ্দিন গভর্নর জেনারেল করাচিতে, লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী, ওদের ভাষায় উজিরে আলা, পূর্বপাকিস্তানে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন, তারা কর্ডন প্রথা করেছেন, এক জেলার উদ্বৃত্ত খাদ্য আরেক জেলায় তারা যেতে দেবেন না, তার প্রতিবাদে প্রদেশ জুড়ে কত মিছিল মিটিং!

খুলনা জেলাতেই মারা গেছে বিশ হাজার মানুষ, আওয়াজ উঠেছে। শেখ মুজিবের মাথা গরম হয়ে যাওয়ার উপক্রম। বাংলার মানুষ কি কেবল দুঃখই পাবে, কষ্ট স্বীকার করে যাবে! আর পাঞ্জাবি লিয়াকত খান প্রধানমন্ত্রীত্ব ফলাতে আসবেন ঢাকায় ? ফুড কনফারেন্স করবেন ?

মওলানা ভাসানী সভাপতি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের। মাস চারেক আগে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক সদ্য নির্বাচিত আইনপরিষদের সদস্য শামসুল হক। যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিব। সহসভাপতি আতাউর রহমান খান। ভাসানী জনসভা ডেকেছেন আরমানিটোলা ময়দানে। খাদ্য-সংকটের প্রতিবাদে এই জনসভা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এই জমায়েত।

সরকার সমর্থক দৈনিক *আজাদ* লেখে, খাদ্য-সংকট যখন প্রায় দূরীভূত হয়েছে, এমতাবস্থায় উজিরে আলা নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের পূর্ববঙ্গ সফরে বিঘ্ন সৃষ্টিই ওই দলের ওই জনসভার উদ্দেশ্য।

এর আগে যতবার আওয়ামী মুসলিম লীগ বা সোহরাওয়ার্দী সমর্থক মুসলিম লীগ জনসভা আয়োজনের চেষ্টা করেছে, পুরনো ঢাকার স্থানীয় উর্দুভাষী গুণ্ডাদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিংবা শাহ আজিজের নেতৃত্বে মুসলিম লীগাররা এসে সভামঞ্চ ভাঙচুরের চেষ্টা চালিয়েছে।

শেখ মুজিব এখন কারাগারের বাইরে। কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন কারাগারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সে সময় আরমানিটোলা ময়দানে আয়োজিত ভাসানীর জনসভার চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে মঞ্চে উঠে বাঁদর নাচ নেচে গেছে শাহ আজিজ। সেদিন মুজিব কারান্তরালে ছিলেন, তাই শাহ আজিজ এই স্পর্ধা দেখাতে পেরেছিল। আজ আসুক দেখি।

শেখ মুজিব যেদিন ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ছাড়া পান, সেদিন কারাগারের মূল ফটকে ভিড় জমে গিয়েছিল। ইয়ার মোহাম্মদ খান গিয়েছিলেন খোলা জিপ নিয়ে। সঙ্গে ছিলেন শামসুল হক। আর ছিলেন মুজিবের আব্বা শেখ লুৎফর রহমান। শেখ লুৎফর তার জন্যে অনেক কষ্ট করছেন। বারবার ঢাকায় আসা, ছেলের সঙ্গে দেখা করা। কষ্ট করছেন বেগম মুজিব। দু'দুটো ছোট বাচ্চা নিয়ে পড়ে আছেন টুঙ্গিপাড়ায়।

মুজিব আজকে প্রস্তুতি নিচ্ছেন আরমানিটোলার জনসভা সফল করতে। বাধা আসবে যেখানে লড়াই হবে সেখানে। সোহরাওয়ার্দী-সমর্থক মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মীদের মুজিব আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে বলে দিয়েছেন। সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক কর্মী প্রস্তুত হয়ে আছে মঞ্চের চারদিকে। তাদেরকে বলেছেন, হাতে পোস্টার রাখবে। পোস্টারে লেখা থাকবে, অন্ন দাও বস্ত্র দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও। পোস্টারগুলো বাঁধা থাকবে গজারিকাঠের শক্ত লাঠির মাথায়। আক্রমণ এলে পোস্টারগুলো সব লাঠি হয়ে যাবে। মুজিবের চোয়াল শক্ত, বাহুর পেশি টানটান। গোপালগঞ্জের চরের লাঠিয়ালদের ঘূর্ণমান লাঠির শনশন আওয়াজ তার মাথার মধ্যে গুঞ্জরণ তুলেছে। কুষ্টিয়াতে মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে শাহ আজিজকে যে মুষ্ঠাঘাতটা করেছিলেন, সেটা মনে করেন। ফরিদপুরে মুসলিম লীগের সম্মেলনে কিংবা কলকাতায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনে বহুত গুণ্ডার মোকাবেলা মুজিব করেছেন। এইসব গুণ্ডাদলের মনোবল বলতে কিছুই থাকে না, একবার তুমি বুক চিতিয়ে দু'বাহু বিস্তার করে রুখে দাঁড়াও, খবরদার বলে হুংকার ছাড়ো, দেখবে সব কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে।

মোল্লা জালাল উদ্দিন এখন ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি। তিনি বিষয়টা বুঝে নিয়েছেন। আজকের জনসভা কিছুতেই ভণ্ডুল করতে দেওয়া যাবে না শাহ আজিজ ও তার গুণ্ডাদলকে। তাদেরকে রুখতে হবে। ছাত্রলীগের কর্মীরা প্রস্তুত হও।

মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী গুণ্ডা ভাড়া করেছেন জনসভা আক্রমণ করার জন্যে। খবর আসে। কর্মীরা ঘিরে আছে পুরোটা মাঠ।

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়তে থাকে। আর পুবদিকে নিজের ছায়া ফেলে আসতে থাকে মানুষ, বিক্ষুব্ধ মানুষ, কষ্টভোগী মানুষ, একে একে। জনসভা শুরুর আগেই ময়দান লোকে ভরে যেতে লাগল। গুণ্ডারা এল সেইসময়, যখন আরমানিটোলা মাঠের ধারের লম্বা পাকুড়গাছটার ছায়া হলুদ রোদে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। আর তারই নিচে এরই মধ্যে হাজারখানেক লোক উপস্থিতও হয়েছে।

গুণ্ডাদের দেখেই লাঠিতে বাঁধা পোস্টারগুলো হাতে নিয়ে ছাত্রকর্মীদল স্লোগান ধরল, গণবিরোধী লিয়াকত খান, ফিরে যাও পাকিস্তান। সেই স্লোগানে কণ্ঠ মেলাল উপস্থিত জনতা। গুণ্ডারা দেখল, এখানে হামলা করতে গেলে হাড্ডি আর মাংস আলাদা করে নিয়ে তারা বাড়ি ফিরতে পারবে না। তারা কেটে পড়ল।

মাথায় বেতের টুপি, পরনে লুঙ্গি, গায়ে পাঞ্জাবি—ভাসানী এলেন। সঙ্গে আচকানপরা আতাউর রহমান খান, শামসুল হক। মুজিবুর রহমান এলেন তখনই, যেন শূন্য থেকে, জাদুকরের হাতের কারসাজিতে যেমন শূন্য থেকে বেরিয়ে আসে কবুতর, ফুলের গুচ্ছ, রঙিন ছাতা। তিনি আসলে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চলেছেন। তিনি যেখানেই যান, সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতে শুরু করেন, লোক জমে যায়, তিনি মিছিল করতে শুরু করেন, পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে তার মিছিল প্রতিরোধ করতে যায়। তার বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের একাধিক মামলা পড়েছে এরই মধ্যে। মুজিবুর রহমানের গায়ে শার্ট, কলারওয়ালা, দু'পকেট, পরনে পায়জামা।

সভার কাজ শুরু হলো।

শামসুল হক, আতাউর রহমান খান ভাষণ দিলেন। কিন্তু জনতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব বলে চিৎকার করতে লাগল। এরই মধ্যে তারা জেনে গেছে, এই ২৯-৩০ বছর বয়সী যুবক ভাষণ দেয় চমৎকার। ভাসানী বললেন, ঠিক আছে, এবার শেখ মুজিবরের ভাষণই তাইলে শোনেন।

শেখ মুজিব বললেন, একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে খুন করলে কী হয় ? খুনীর ফাঁসি হয়। এখন নুরুল আমিন দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছেন, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছেন দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ? তাহলে তার শাস্তি কী হওয়া উচিত ?

জনতার মধ্য থেকে চিৎকার ওঠে, নুরুল আমীনকে এই মাঠে এনে গুলি করা উচিত।

শেখ মুজিব বলেন, শোনেন নুরুল আমীন, জনতার রায়। লজ্জা শরম কিছু থাকলে এখনই পদত্যাগ করেন।

জনতা চিৎকার করে ওঠে, নুরুল আমীন গদি ছাড়ো। ভাত দাও কাপড় দাও নইলে গদি ছেড়ে দাও।

মুজিবের ভাষণ শেষে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভাষণ দিতে শুরু করেন।

তার ভাষণে বাংলার নিরন্ন মানুষের হাহাকার ধ্বনিত হতে থাকে ময়দান জুড়ে। শকুনির ছায়া দেখতে পায় প্রতিটা মানুষ।

মানুষের শোককে তিনি অচিরেই পরিণত করেন ক্ষোভে। ঘোষণা করেন, এবার আমরা মিছিল করে যাব গভর্নর হাউজের দিকে, লিয়াকত আলী খানকে ঘেরাও করব।

মিছিল শুরু হয়। ভাসানী, শামসুল হক, মুজিব সামনে। এরই মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে গভর্নর হাউজের আশপাশের এলাকায়।

মিছিল নাজিরাবাজার রেলক্রসিংয়ের কাছে এলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে শুরু করে। লাঠি চার্জ করে। মওলানা ভাসানী আর শামসুল হককে গ্রেপ্তার করে।

মুজিব জানতেন, তার ওপরে হুলিয়া আছে। পুলিশ যে-কোনো সময়ে তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। তিনি মুহূর্তেই সেখান থেকে সটকে পড়েন।

রাতে যান মোগলটুলির পার্টি অফিসে। অনেকেই পুলিশের লাঠির আঘাতে মারাত্মক আহত হয়। ডাক্তার করিমকে ডেকে আনা হয়। তিনি আহতদের ব্যান্ডেজ করেন। ওষুধ দেন।

মুজিব জানেন, ভাসানী গ্রেপ্তার হয়েছেন। শামসুল হকও। এই অবস্থায় যুগ্মসম্পাদকের ধরা দেওয়া চলে না।

তিনি দুজন কর্মীকে দায়িত্ব দেন বাইরে সার্বক্ষণিক নজর রাখার। পুলিশ দেখলেই তারা আওয়াজ দেবে। ভোরবেলা সবে যখন এই পরিশ্রান্ত কর্মীদের চোখ একটু ধরে এসেছে, তখনই প্রহরারত কর্মীদ্বয় এসে মুজিবের শরীরে ধাক্কা মারে, মুজিব ভাই, ওঠেন ওঠেন। আইয়া পড়ছে। দোতলার বারান্দা থেকেই পাশের বাড়ির ছাদে যাওয়ার পথ তারা দেখেই রেখেছিলেন। শেখ মুজিব, আবদুল মতিন, শওকত আলী, এমনকি গ্রেপ্তার এড়াতে এখানে এসে আশ্রয় নেওয়া ইয়ার মোহাম্মদ সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির পেছনের বারান্দা থেকে প্রথমে পাশের বাড়ির ছাদে, সেখান থেকে দেয়াল টপকে চলে যান মৌলভিবাজারের দিকে।

পুলিশ বাড়িতে আসে। বাড়ি তল্লাশি করে শেখ মুজিব আর শওকতের খোঁজে। না পেয়ে তারা চলে যায়।

দিনের বেলা পুলিশ রিপোর্ট লেখে:

একটা সূত্র থেকে খবর পেয়ে ১৫০ মোগলটুলির ইস্ট পাকিস্তান মুসলিম লীগ অফিস সকাল ৪টা ৩০ মিনিটের দিকে তল্লাশি করা হয়। পার্টির দুইজন জঙ্গি সদস্য শেখ মুজিব ও শওকত আলীকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে এই তল্লাশি পরিচালিত হয়। এরা দীর্ঘদিন ধরে গ্রেপ্তার এড়িয়ে যাচ্ছে। যাদের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মামলা আছে। তাদেরকে সেখানে পাওয়া যায় নি। কোনোকিছু জব্দও করা যায় নি।

শেখ মুজিব আশ্রয় নেন ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোল্লা জালাল উদ্দিনের খাজে দেওয়ান নামের আস্তানায়। আবদুল হামিদ চৌধুরী, মোল্লা জালাল উদ্দিন আর অলি আহাদ মিলে বসেন পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে।

সবাই মিলে সাব্যস্ত হয়, মুজিব লাহোরে চলে যাবেন। যাবেন লিডার সোহরাওয়ার্দীর কাছে। পরামর্শ করবেন। দিক-নির্দেশনা আনবেন। পার্টির খরচ পরিচালনার জন্যে তহবিল সংগ্রহও করতে হতে পারে।

পূর্ব বাংলার পুলিশ আর তাকে খুঁজে পায় না।

এরপরের রিপোর্ট আসে লাহোর পুলিশের কাছ থেকে, ওখানে শেখ মুজিব কী করছেন না করছেন পুলিশ রিপোর্ট করতে থাকে।

দু'মাস পশ্চিম পাকিস্তানে থেকে তিনি সেখানকার সরকারবিরোধী নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন। এমনকি তিনি সেখানে সাংবাদিক সম্মেলনও করেন। পূর্ববংলার দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন সাংবাদিকদের সামনে। পাকিস্তানি রাজনীতিটা বুঝতে ওই সফর তাকে সাহায্য করেছিল।

১৯৫০ সাল। পহেলা জানুয়ারি। শুভ নববর্ষে পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ একটা চমৎকার উপহার তুলে দিতে পারেন সরকারকে।

শেখ মুজিব ঢাকায় গ্রেপ্তার হন।

খাজা তার গানের আসরে বসে সেই খবর লাভ করে খুশিতে নিজেই নাচতে থাকেন। নুরুল আমীন বহুদিন পরে আরাম করে ঘুমোন। তাদের জানের দুশমন ধরা পড়েছে।

আন্দোলনে ভাটা পড়ে। ভাসানী, শামসুল হক, শেখ মুজিব, তিন গুরুত্বপূর্ণ নেতা জেলে। এখন আন্দোলন পরিচালনা করতে পারেন সহসভাপতি আতাউর রহমান খান, যুগ্ম সম্পাদক খন্দকার মোশতাক। তারা দুজন একটা জুটি বাঁধেন। ওকালতির জুটি। তারা আটঘাট বেঁধে ওকালতি করতে শুরু করলেন।

১৯৫০-এর ঢাকা ছিল প্রধানত সদরঘাট নবাবপুর আরমানিটোলা মাহুতটুলি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। বুড়িগঙ্গা বেয়ে সদরঘাট থেকে লঞ্চ বা স্টিমার ছাড়ত, কেউ সন্ধ্যার পর সিটি বাজাত না, পাছে আহসান মঞ্জিলের নবাব পরিবারের আদমিদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে।

শিল্পী আব্বাসউদ্দিন থাকতেন পাতলা খান লেনে। তারপর এসে ওঠেন পুরানো পল্টনে, ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের পেছনের কালাগনিতে। কলকাতা থেকে এসে তিনি হয়েছেন পূর্ববাংলা সরকারের প্রচার বিভাগের অতিরিক্ত সংগীত প্রচারণা কর্মকর্তা। আব্বাসউদ্দীনকে পল্টনবাসী দেখতে পায় সাইকেলের ওপরে, তাদের ধারণা হয়, তিনি সারাক্ষণ সাইকেলেই থাকেন, দুটো পায়ের অতিরিক্ত তার দুটো চাকাও আছে। সারাক্ষণ ঘোরে সেটা। লোকে জিজ্ঞেস করে, কেমন আছেন ? তিনি সাইকেলের গতি শ্লথ করে বলেন, ভালো। এবার প্রশ্নকর্তার সম্পূরক প্রশ্ন, বাড়ির সবাই ভালো ? তিনি সাইকেল থামান। ক্যাচ করে শব্দ হয়। একদিকে একটা পা নামিয়ে তিনি বলেন, 'আপনি তো আচ্ছা লোক সাহেব, বাড়িতে আমার স্ত্রী আছে, তিন ছেলেমেয়ে আছে, এক সঙ্গে সবাই ভালো থাকবে, এমন আশা করেন কী করে ?' তারপর আবার সাইকেলে প্যাডেল মারেন। প্রশ্নকর্তা তার প্রস্থানের দিকে বিমূঢ় তাকিয়ে থাকে।

আনিসুজ্জামন তখন স্কুলের ছাত্র। লাইনে পড়েন। কলকাতা থেকে এসেছেন '৪৭-এর পরে, খুলনা হয়ে ঢাকায়। থাকেন শান্তিনগরে। ঘুরে বেড়ান সাহিত্য-সম্মেলনে। আব্বাসউদ্দীনকে দেখলে সালাম দেন। বাপরে, এতবড় গায়ক।

একদিন আব্বাসউদ্দীন সাইকেল থামিয়ে আনিসুজ্জামানকে বলেন, বুঝলে, আল্লাহ্ যে আছেন, তার চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কীভাবে ? আনিসুজ্জামান মাথা চুলকে জানতে চান।

তাছাড়া পাকিস্তান চলছে কী করে ? বলে সাইকেল চালিয়ে তিনি হীরামন মঞ্জিল নামের তার বাড়ির দিকে চলে যান, যেখানে মাঝে-মধ্যে বসে সাহিত্য আর সঙ্গীতের আসর, কিশোর আনিসুজ্জামানও মাঝে মধ্যে সেসব আসরে উঁকিঝুঁকি মারেন।

শান্তিনগরে তখন বিদ্যুৎ ছিল না, পানির সরবরাহ ছিল না, কিন্তু শান্তি ছিল। চারদিকে গাছপালা। পাতার গন্ধ, ফুলের গন্ধ। পাখির ডাক, ঝিঁঝিঁর রব। রাতে শেয়ালও ডাকে। আনিসুজ্জামানের বড় ভালো লাগে।

শান্তিনগরে অশান্তির কোনো কারণ ঘটত না। কবি গোলাম মোস্তফাও থাকতেন শান্তিনগরে। তাঁর শ্যালিকারা আসতেন সেখানে। আনিসুজ্জামানরা তখন ওই কবির বিখ্যাত কবিতা থেকে আবৃত্তি করতেন, দেখে শুনে করিলাম তালিকা, সবচেয়ে সুমধুর ছোট শ্যালিকা।

গোলাম মোস্তফার ছেলে মুস্তফা মনোয়ার ওরফে মন্টু। তিনিও পড়েন ক্লাস নাইনে। তাঁরও ছিল একখানা সাইকেল। ছবি আঁকা, গান করা আর রসিকতা করা—মন্টুর গুণের অভাব ছিল না।

আনিসুজ্জামানকে নিয়ে সাইকেলের সামনে বসিয়ে সে ঘুরত পাড়াময়, তখন এক সাইকেলে দুজন ওঠা নিষিদ্ধ, পারলে পুলিশ এই অপরাধে নিযুক্ত সাইকেল-আরোহীকে আটকও করতে পারে। মন্টু যথারীতি আরেকজনকে তার সাইকেলে বসিয়ে চলেছেন প্যাডেল ঠেলে, ক্রিং ক্রিং ঘন্টি বাজিয়ে, পথে পুলিশ হাঁক ছাড়ল, 'দো আদমি কিঁউ ?'

'আওর এক নেহি মিলা'—বলে মন্টু অবলীলায় চলে গেল তার গন্তব্যের দিকে।

সাইকেলে বাতি থাকাও তখন বাধ্যতামূলক ছিল। মন্টুর সাইকেলে বাতি ছিল না। আরেকবার পুলিশ তাকে জিজ্ঞেস করল, 'সাইকেল মে বাত্তি নেহি হ্যায় কিঁউ ?'

মন্টু সাইকেলের গতি দিল বাড়িয়ে, আকাশে তখন জ্বলজ্বল করছে চাঁদ, সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মন্টু বললেন, আল্লাহ মিয়া

এত্তা বাত্তি দিয়া, সাইকেল মে বাত্তি জরুরত নেহি হ্যায়।

কবি জসীমউদ্‌দীন ছিলেন গায়ক আব্বাসউদ্দীনের অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

তিনি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের বন্ধু।

ফজলুর রহমান ঢাকায় এসেছেন। সাংবাদিক সম্মেলন করলেন, বললেন, বাংলা লেখা হবে আরবি বর্ণমালা দিয়ে। তাহলেই সব প্রদেশের মধ্যে বিভেদ দূর হবে। আর আরবি লেখা সহজ। এই ভাষায় টাইপ রাইটার আছে। সিন্ধুর ভাষা সিন্ধি, কিন্তু তার হরফ আরবি। পশ্চিম পাঞ্জাবের ভাষা উর্দু, তবে তার হরফ নাসতালিক। সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচস্থানের ভাষা পশতু, সেও তো বহুলাংশে আরবি। এখন শুধু বাংলা ভাষাটা যদি আরবিতে লেখা যায়, তাহলেই হয়ে যায়। কারণ আরবি হচ্ছে হরফুল কুরআন।

জসীমউদ্‌দীন সাহেবের কানে গেল এই প্রেস কনফারেন্সের কথা। তাকে লোকজন বলাবলি করতে লাগল, আপনার বন্ধু ফজলুর রহমান তো পাগল হয়ে গেছে। কী বলছে সে এইসব ?

জসীমউদ্‌দীন গেলেন ফজলুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন সরকারি অফিসে, তখন তিনি সরকারি লোকজন আর পার্টির দর্শনার্থীদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছেন। জসীমউদ্‌দীন বললেন, আমি আপনার সাথে বর্ণমালা বদলের ব্যাপারে কথা বলতে চাই।

ফজলুর রহমান বললেন, আজ রাত ৮টার পরে আপনি মওলা মিঞার বাড়ি আসবেন।

মওলা মিয়ার বাড়ি ফুলবাড়িয়ায়। রাত সাড়ে ৭টার দিকে জসীমউদ্‌দীন ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন ফুলবাড়িয়া যাবেন বলে। ঘোড়ার গাড়ি চলছে। অশ্বখুরের আওয়াজ উঠছে খটখট। বাতাস বইছে মৃদুমন্দ। সেই বাতাস জসীমউদ্‌দীনের চুল উড়িয়ে নিচ্ছে।

জসীম ভাবছেন, এ আমি কার কাছে চলেছি। ফজলুর রহমান ? সে তো এক কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন, '৪৭-এর আগে, তিনি ছিলেন সেই বিরল মানুষদের একজন, যাঁরা আহসান মঞ্জিলের খান্দানের বাইরে নেতৃত্বের গুণ দেখিয়ে অনেকেরই প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। ছাত্র হিসেবে ভালো ছিলেন না বলেই হল সংসদের নির্বাচনে দাঁড়াতেন না, কারণ ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদের নির্বাচনে ছাত্ররা ভালো ছাত্রদেরকেই ভোট দিত। নবাব না হয়েও, গ্রাম থেকে এসেও, ছাত্রদের আকৃষ্ট করার ক্ষমতা দেখিয়ে রাজনীতিতে নতুন একটা পথের সন্ধান ফজলুর রহমান দিতে পেরেছিলেন। ফজলুর রহমান অবশ্য ওকালতিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। ওকালতি জীবনের শুরুতেই তিনি হোঁচট খান। সরকারি উকিলের নথি থেকে কাগজ সরাতে গিয়ে তিনি ধরা খান। সিনিয়র উকিল তার পক্ষ থেকে ক্ষমা চান, একেবারে আনকোরা নতুন উকিল, ও জানে না, কোন নথির কাগজ কোথায় রাখতে হয়, ভুল করে ফেলেছে, মাফ করে দিন। আদালত তাকে মাফ করে দেন, কিন্তু তার ওকালতি জীবনের সেখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। অতএব তিনি পেশা হিসেবে বেছে নেন রাজনীতিকেই। তিনি জনসমক্ষে বক্তৃতা করতে পারতেন না, আলাপ-আলোচনাতেও কোনো শালীনতা দেখাতে পারতেন না, কারণ কী ইংরেজি কী বাংলা, কোনো ভাষাই তিনি ভালোভাবে রপ্ত করতে পারেন নি। তিনি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। প্রথম যখন রাজনীতি শুরু করেন, তার পকেট ছিল খালি, তার না ছিল কোনো রাজনৈতিক গুরু। তার ভাই গ্রামের সম্পত্তি সব আত্মসাৎ করায় তিনি ছিলেন কপর্দকহীন। বাবুবাজারের মেসে থাকতেন, তার খাবার বন্ধুরা টিফিন কেরিয়ারে করে পাঠিয়ে দিত। বাবুবাজার থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া ছিল দুই আনা, সে পয়সাও তার খরচ করার সাধ্য ছিল না। তিনি তার প্রতিবন্ধিতা জয় করে হেঁটে হেঁটে আসতেন। বন্ধুরা তার জন্যে সব কিছু করতে পারত, তিনিও পারতেন বন্ধুদের জন্যে যে-কোনো কিছু করতে। আর তার ছিল এক অভূতপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতা। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭, ঢাকার মুসলিম লীগ রাজনীতিতে যে তরুণেরা সক্রিয় ছিল, শামসুল হক, আজিজ আহমেদ, খন্দকার মোশতাক, এমনকি কামরুদ্দীন আহমদ, সবাই তার ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে এই ফজলুর রহমানই তো নিজের নামটা হাস্যকর করে তুলেছেনও, পুরো বাংলার নামই তিনি ডোবাবেন।

ফুলবাড়িয়া গিয়ে দুই আনা পয়সা গুনে দিলেন কবি জসীম, পাঞ্জাবির পকেট থেকে। ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে, বারান্দা অন্ধকার। দরজা খোলা। তিনি পর্দা ঠেলে গলা খাকারি দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলেন, শিক্ষা সচিব ফজলে করিম আর অধ্যাপক সাহিত্যিক সৈয়দ আলী আহসান ভেতরে বেতের সোফায় বসে আছেন। মন্ত্রী এদেরকে আগেই ডেকে এনেছেন, যাতে কবির সঙ্গে তর্কে জয়লাভ করতে পারেন। জসীম উদ্‌দীন মনে মনে হিসেব কষলেন।

মন্ত্রী ভেতরের ঘর থেকে পায়জামায় গিট দিতে দিতে ভেতরে প্রবেশ করলেন। কুশল বিনিময়ের পরে জসীমউদ্‌দীন বললেন, 'আপনি কি করছেন ? আপনি কি চান বাঙালিরা পশ্চিমাদের কাছে জীবনের সব ক্ষেত্রে সংগ্রামে হেরে যাক ? বাংলার পরিবর্তে উর্দু হরফ, আরবি হরফ এসব কী শুনছি ?'

ফজলুর রহমান সাহেব সোফায় বসে দু'পা নাচাতে নাচাতে বললেন, বাঙালি জাতি সম্পর্কে আপনার দেখছি বড়ই খারাপ ধারণা! বাঙালিরা সব পারে। তারা খুব দ্রুত উর্দু বর্ণমালা শিখে নিয়ে পশ্চিমা ছাত্রদের হারায়া দিবে।

সৈয়দ আলী আহসান বললেন, ঠিক, বাঙালিরা সব পারে।

ফজলে করিম, যিনি এরই মধ্যে মন্ত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে হরফুল কুরআন বিষয়ে একজন স্কুল মৌলভির লেখা বইকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে নিজের নামে প্রকাশ করেছেন, তিনি জোর গলায় মন্ত্রীর বক্তব্য সমর্থন করলেন।

জসীমউদ্‌দীন বললেন, আপনার এই কথা আমি সমর্থন করি না। এখনই আমাদের দেশে ছাপাখানা নাই, কাগজ নাই, প্রকাশনা নাই, এর মধ্যে আমাদের অতীতকালের যেসব সাহিত্যিক তাদের অমর অবদান রেখে গেছেন তা উর্দুতে রূপান্তরের সাধ্য সরকারের নাই। উর্দু অক্ষর বা আরবি অক্ষর করলে আমাদের ছাত্ররা সেই সাহিত্য উপভোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

ফজলুর রহমান বললেন, সরকার ইচ্ছা করলে কি না পারে। কামাল পাশা অল্প দিনের মধ্যেই তুরস্কের বর্ণমালা বদলে দিয়েছেন।

জসীমউদ্‌দীন ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, কামাল পাশার মতো বড় প্রতিভা তো আমাদের দেশে নাই।

মন্ত্রী সটান দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, কে বলল নাই ? এই দেখেন আপনার সামনে কে দাঁড়ায়া আছে। আমিই এই কাজ করব। দেখেন বাংলা ভাষায় কোনো লাইনো টাইপ মেশিন নাই, টাইপ রাইটার নাই, উর্দু ভাষায় আছে। উর্দু হরফে লেখা হলে আমরা এইসব মেশিনের সাহায্য পাব।

জসীম বললেন, উর্দুর অনেক আগে থেকে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা লাইনো টাইপ মেশিন ও টাইপ রাইটার আছে।

ফজলে করিম বললেন, আপনি ভারতের দিকে অত তাকাচ্ছেন কেন ?

সৈয়দ আলী আহসান তার দাড়ি নাড়তে নাড়তে বললেন, এখন আমরা আজাদ। সবকিছুতে আর পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে চলবে না। সারা পৃথিবীর মুসলিম সভ্যতার দিকে তাকাতে হবে। আরবি শিখলে সেটা সহজেই সম্ভব।

জসীমউদ্‌দীন বললেন, সৈয়দ আলী আহসান, তুমি কথা বলছ কেন ? আমি এসেছি আমার বন্ধু ফজলুর রহমানের সাথে কথা বলতে। তোমাদের সাথে তো কথা বলতে আসি নি।

সৈয়দ আলী আহসান চুপ করে গেলেন।

ফজলে করিম থামার পাত্র না। তিনি বললেন, আপনি মুসলিম সভ্যতায় বিশ্বাস করেন না ?

জসীমউদ্‌দিন স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, মুসলিম সভ্যতা বলে কিছু আছে কিনা জানি না। তবে পারস্য সভ্যতা আছে, আরব সভ্যতা আছে, বাঙালি সভ্যতাও তেমনি আছে।

শুনে ফজলে করিম আর সৈয়দ আলী আহসান হেসে উঠলেন যেন ভারি একটা কৌতুকের কথা এইমাত্র তারা শ্রবণ করলেন।

জসীম সেদিকে না তাকিয়ে ফজলুর রহমানকে বললেন, আপনি উর্দু আরবি বর্ণমালা প্রবর্তন করতে চেয়ে বাঙালি সন্তানদের এক চোখ কানা করে দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু

করে আধুনিক কাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যে অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত হবে।

ফজলুর রহমান প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, আমিও তো তাই চাই। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের প্রতি যেন বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা আকৃষ্ট না হয়। তাহলে তারা আর বিশ্বাসঘাতক হতে পারবে না।

জসীম বললেন, তাহলে আজ থেকে আমি আপনার বিরোধিতা করতে শুরু করলাম।

ফজলুর রহমান বললেন, তাহলে সেই কাজ তোমাকে একাই করতে হবে। কেউ তোমার পাশে দাঁড়াবে না।

যদি না দাঁড়ায় তবে আমি একলাই দাঁড়াব। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।

জসীমউদ্‌দীন একাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সৈয়দ আলী আহসান আর ফজলে করিম মন্ত্রী সন্নিধানে বসেই রইলেন।

তখন অনেক রাত। ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে ট্রেন আসছে। শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এখন কোনো ঘোড়াগাড়ি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। জসীমউদ্‌দীনকে একা অনেকটা পথ যেতে হবে।

ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে গেলে রিকশা পাওয়া যাবে। তিনি সেদিকেই পা বাড়ালেন। মাঘ মাস পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এক মাঘে শীত যায় না। তরুছায়ায় ঘেরা ঢাকা শহরে ভীষণ শীত। এত ঠাণ্ডা কেন? কামরুদ্দীন সাহেব তার জিন্দাবাহারের বাসায়।

শীতে তিনি ঠকঠক করে কাঁপছেন। ৩৮ বছর বয়সী এই উকিল রাজনীতিকের শরীর এতটা বুড়ো হয় নি যে তিনি শীতে কাঁপবেন।

আসলে তার শরীর কাঁপছে ভয়ে, দুশ্চিন্তায়, উত্তেজনায়।

তার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন বিপরীত দিকে অবস্থিত হারমোনিয়মের দোকানের মালিক রসিকদাসের মেয়ে আর জামাই।

সকালবেলা, তখনো কুয়াশা কাটে নি পথে, তখনো সূর্য পুরোপুরি দখল নেয় নি আকাশের। এরই মধ্যে এই কাণ্ড।

কামরুদ্দীন সাহেব তাদের বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে রাখলেন। পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা বেধেছিল আগেই। এখন ঢাকায় লেগে গেছে।

মেয়েটি শাখা সিঁদুর পরা, তাকে

কামরুদ্দীন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবা এল না ?

মেয়েটি মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে বলল, বাবারে কইছিলাম আইতে। বাবা কইল, আমি এইহানে এতু বছর, আমারে এই পাড়ার হকলে চিনে। আমারে কেউ মারব না মা। তুই যা। জামাইরে লগে লইয়া যা।

আচ্ছা তোমরা থাকো। ওদের নিচতলার ঘরে বসিয়ে বাইরের লোহার শক্ত দরজাটা ঠিকমতো লাগিয়ে কামরুদ্দিন সাহেব দোতলায় উঠলেন।

এত ঠান্ডা কেন!

তিনি কাঁপছেন আর আবহাওয়াকে দুষছেন।

গুণ্ডারা এলো হইহই রইরই করতে করতে। হরিদাসের বাড়িটা ঠিক উল্টো দিকেই। তারা এসে তার দরজা ধাক্কা দিতে লাগল।

কামরুদ্দিন সাহেব জানালা দিয়ে দেখতে লাগলেন, ঘটনা কী!

ওরা গেটটায় ধাক্কা মারছে। বড় ইট এনে বাড়ি মারছে দরজায়। শাবল খুন্তি দিয়ে নানা কসরত করছে। সত্যি দরজাটা ভেঙে ফেলল যে!

রসিক দাস কী করবে এখন। সে পেছনের জানালা দিয়ে মারল এক লাফ। তারপর দৌড়াতে শুরু করল।

গুণ্ডারা টের পেল একটু পরেই। তারাও দৌড়াতে শুরু করল রসিক দাসের পেছন পেছন। গুন্ডারা দৌড়াচ্ছে। ভয়ে উত্তেজনায় আতঙ্কে কামরুদ্দিন সাহেবের শরীর হিম হয়ে আছে।

ইস, রসিক দাস পড়ে গেল হোঁচট খেয়ে।

একটা গুণ্ডা এত্ত বড় একটা ছুরি ওর পেটের মধ্যে... ও মা গো...

বীরপুরুষেরা আবার এসে ঢুকল তার বাড়িতে। ঢুকে দেখল, মেয়েটি নাই। এত বড় শিকার হাতছাড়া!

হায়, হায়, তারা এসে যে এই বাড়ির দরজাতেই ধাক্কা মারতে লাগল।

রসিক দাসের মেয়ে আর জামাই দোতলায় এসে কামরুদ্দিন সাহেবের পায়ে পড়ল। দরজা খুলবেন না, ওরা আমাদের মেরেই ফেলবে।

গুণ্ডারা ছুরি উঁচিয়ে এ বাড়ি লক্ষ্য করে চেঁচাচ্ছে।

গুণ্ডারা রাস্তা ছাড়ছে না।

এত শীত। পৃথিবীর সব শৈত্য এসে যেন জিন্দাবাহার লেনের এই বাড়িতে আছড়ে পড়ছে। বিকল শরীর নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কামরুদ্দীন।

তার স্ত্রী নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছেন ওই মেয়েটিকে আর তার বরকে।

প্রায় ঘণ্টাখানিক পরে গুণ্ডারা চলে গেল। আবার আসবে না তো!

গেছে, দরজায় আবার ধাক্কা।

উফ। এইভাবে বাঁচতে পারা যায়।

কামরুদ্দীন জানালার কাছে এসে উঁকি দিলেন। অলি আহাদ।

তাড়াতাড়ি গেট খুলে তাকে ভেতরে আনলেন কামরুদ্দীন সাহেব।

অলি আহাদ বললেন, দেখেছেন কী পরিস্থিতি! দাঙ্গা বেধে গেছে। চলেন পার্টি অফিসে। আমাদের কর্তব্য ঠিক করতে হবে। আলোচনা করতে হবে।

কামরুদ্দীন বললেন, আমার প্রথম কর্তব্যটা কী আমি জানি।

কী ?

আমার ঘরে একটা হিন্দু মেয়ে আর তার জামাই আশ্রয় নিয়েছে। ওর বাবা রসিক দাসকে একটু আগে গুণ্ডারা খুন করেছে। ওকে আগে আমি নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাব। তারপর অন্য কাজ। আপনি এক কাজ করেন। পার্টি অফিস থেকে কয়েকজন ছেলেকে পাঠান। খুব বিশ্বস্ত ছেলে হতে হবে। আমি আগে ওদেরকে নিরাপদ স্থানে সরাব। সূত্রাপুরের দিকে হিন্দুপাড়ায়।

অলি আহাদ চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে এল কয়েকজন যুবক। তারা বলল, তাদেরকে অলি আহাদ পাঠিয়েছেন।

কামরুদ্দিন তার বাড়ির দেয়ালের পেছনের দিকটা ভাঙতে লাগলেন যুবকদের সহায়তায়। তারপর একটা ফোকর বেরুলে সেই পথে রসিক দাসের মেয়ে আর জামাতা যুবকদের প্রহরায় বিদায় নিল।

কামরুদ্দীন সাহেব সেদিন আর পার্টি অফিসে যাওয়ার সাহসই পেলেন না।

সন্ধ্যায় এলেন তাজউদ্দীন সাহেব।

২৫ বছর বয়সী এই যুবকের বোধ করি শীত লাগে না। বিকালের দিক থেকে একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছে আর সঙ্গে বইছে ঝড়ো বাতাস। কামরুদ্দীন সাহেব পায়ে মোজা পরে লেপের নিচে ঢুকেও শরীর থেকে শীত তাড়াতে পারছেন না। এর মধ্যে শীতকালের বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তাজউদ্দীন এলেন।

কী করেছেন ? একটা গামছা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন কামরুদ্দীন, এমন দুর্যোগের দিনে একা একা এলেন...

শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম কামরুদ্দিন সাহেব। মনটা খুব খারাপ। নবাবপুর, সদরঘাট, পাটুয়াটুলি, ইসলামপুর, দিগবাজার, ইংলিশ রোড, চক বাজার সব ঘুরে ঘুরে এলাম। সবখানে ধ্বংসের চিহ্ন। আগুন জ্বলছে হিন্দুদের দোকানপাটে। রাস্তার ধারে লাশ পড়ে আছে।

পুলিশ নাই ? ১৪৪ ধারা না জারি করা হয়েছিল দিনের বেলা ?

বিহারি পুলিশরা আরও উৎসাহ দিচ্ছে। যারা এইসব করছে তারা সবাই মুহাজের। থাকার জায়গা নাই। হিন্দু তাড়িয়ে বাড়িঘর দখল করতে চাচ্ছে। আর পেছন থেকে উসকানি দিচ্ছে মুসলিম লীগের বদমাশ নেতাগুলো।

কিন্তু বাঙালি মুসলমানরা কেউ প্রতিবাদ করছে না ?

না বাঙালিরা চুপচাপ দেখছে, তাজউদ্দীন মাথা মুছতে মুছতে বললেন, রেডিওটা অন করুন তো! কী বলে শুনি।

রেডিওতে বলা হচ্ছে, কারফিউ জারি করা হয়েছে। কারফিউয়ের মেয়াদও বাড়ানো হলো। বিকাল ৫টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।'

কামরুদ্দীন লুঙ্গি আর শার্ট এনে দিলেন তাজউদ্দীনকে। ভেজা কাপড় ছেড়ে সেসব পরে নিলেন তাজউদ্দীন। আজ রাতে আর হলে ফেরা হবে না।

অলি আহাদ এসেছিলেন। পার্টি অফিসে ডেকেছিল শান্তির পক্ষে কিছু একটা করা যায় কিনা। আজ আমার এখানেই যা ঘটেছে, তারপর... সবিস্তারে ঘটনা বর্ণনা করলেন কামরুদ্দীন আহমদ। বললেন, আমার তো ভয় করছে গুণ্ডারা না এবার আমাকেই আক্রমণ করে বসে। আপনি রাতটা থাকেন। কিছুটা সাহস পাই। খুব ঠান্ডা পড়েছে তাজউদ্দীন সাহেব। খুব ঠান্ডা!

তাজউদ্দীন পরের দিন হলে ফিরলেন সকাল সকাল। তারপর গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্লাস হলো না। শান্তিরক্ষার পক্ষে একটা সভা হলো। তাতে ছেলেমেয়ে খুব বেশি উপস্থিত হলো না। তাজউদ্দীন হতাশা বোধ করলেন। মানুষ মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে না বিপদে দুর্যোগে দুর্বিপাকে ?

জয়নুল আবেদীন বিয়ে করতে যাবেন। বর যাত্রা করবে কলকাতাবাজারের সাংবাদিক লেখক আবু জাফর শামসুদ্দীনের বাসা থেকে।

জয়নুল ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্রপারের ছেলে। বাবা পুলিশ বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্মচারী। নরমাল স্কুলের কাছে তার নিজের বাড়ি, ওপরে ঢেউটিন, পাশে তরজার বেড়া। কায়ক্লেশে সংসার চলে, কারণ বৃদ্ধ পিতা অবসর নিয়েছেন।

তিনি আসতে পারবেন না বিয়েতে। বরকর্তা আবু জাফর শামসুদ্দীনই। তখন তার বয়স ৪০-এর মতো।

জয়নুলের বয়স তখন ৩৬।

তার পায়জামা পাঞ্জাবি নেই। টুপিও নেই। আচকানের তো প্রশ্নই আসে না। আবু জাফর তাকে পায়জামা পাঞ্জাবি ধার দিলেন। পাত্রী পড়ে ক্লাস টেনে।

পাত্র ড্রয়িংয়ের শিক্ষক। সরকারি হাই স্কুলে ছবি আঁকা শেখান।

কলকাতায় তিনি ছিলেন কলকাতা আর্ট স্কুলের খ্যাতিমান শিক্ষক। সর্বভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে তিনি পেয়েছিলেন সোনার মেডেল। ১৯৪৩-এর মনন্বতরের ছবি এঁকে কলকাতা তো কলকাতা, পৃথিবীরই টনক দিয়েছিলেন নড়িয়ে। ৫০-এর সেই কুখ্যাত দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকেছিলেন মোটা তুলির দ্রুত টানে, পথের ধারে পড়ে থাকা নিরন্ন কংকালসার নারীপুরুষ আর কাক তার তুলিতে মূর্ত করে তুলেছিল ওই মানবিক বিপর্যয়কে, জাগিয়ে দিয়েছিল মূঢ় বিবেককেও।

আর এখন সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী শিল্পী পরিণত হয়েছেন গরিব এক স্কুল শিক্ষককে কিন্তু তাতে তার মুখের হাসি এতটুকুন ম্লান হয় নি। হাসিমুখে রুমাল চাপিয়ে তিনি চললেন বিয়ে করবেন বলে। স্বজনহীন, বন্ধুবান্ধবহীনভাবে। কিন্তু তবু আকবর বাদশার সঙ্গে তার কোনোই তফাত যেন নেই।

আবদুল হাদি লেনে তার শ্বশুরবাড়ি। সেখানেই বিয়ে পড়ানো হবে। ঘোড়াগাড়ি ডাকা হলো। বরযাত্রী জয়নুল ও আবু জাফরকে নিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করল।

হুজুর, আপনে আসাম গেলেন, ওইসব দিনের গল্প একটু করেন না ? শেখ মুজিব তার চোখ মুছতে মুছতে প্রশ্ন করেন। মুজিবের চোখে সমস্যা করছে। চোখ দিয়ে অবিরাম পানি পড়ছে।

মওলানা ভাসানী, বয়স ৬৫ কি ৭০, মাথায় বেতের টুপি, তোবড়ানো গালে লম্বা সাদা দাড়ি, পরনে লুঙ্গি, হাসেন। মজিবর, সেইসব দিনের কথা শুনবার চাও ?

জি বলেন।

তারা বসে আছেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ঘরে। কেন্দ্রীয় কারাগারের দোতলায় আশ্রয় পেয়েছেন এই বন্দি। নিচে একটা কক্ষে থাকেন শেখ মুজিব, আরেকটায় কমিউনিস্ট নেতা হাজি দানেশ।

শেখ মুজিব আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক। ভাসানী সভাপতি। দুজনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে কারাগারে।

ভাসানীর জন্ম ঠিক কবে, কে জানে, হয়তো ১৮৮০ থেকে ১৮৮৫ সালের কোনো একসময়ে। শৈশবে মা মারা যায়। তারপর নানা ঘাটের পানি খেয়েছেন। পড়াশোনো করেছেন দেওবন্দ মাদ্রাসায়। সিরাজগঞ্জের ছেলে আবদুল হামিদ কলকাতা, পাঁচবিবি, টাঙ্গাইল নানা জায়গায় ঠাঁই গাড়েন। চরমপন্থী দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন কিছুদিন। কিছুদিন টাঙ্গাইলের কাগমারীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। কংগ্রেসে যোগ দেন। জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে বাংলা থেকে বহিষ্কৃত হন। আসামে গিয়ে আশ্রয় নেন। সবসময়েই পীর ফকিরে আস্থা ছিল। আসামেও গিয়েছিলেন পীরের মুরিদ হিসেবেই। মুজিব তার কাছে জানতে চান সেই সময়ের কথা।

শুনবা মিয়া ? পথের ধারে বাঘ শুইয়া থাকে। দিনের বেলাও হাতে হাতিয়ার নিয়া পথ চইলতে হয়। অস্ত্রশস্ত্র নিয়া আগুনের বোন্দা জ্বালায়া তারপর না রাইতে বাইর হইতে হয়। সাপের কামুড়ে দৈনিক মানুষ মরে। মশা একেকটা এত বড়—মশার পায়ে সুতা বাইন্দা রাখতে পারবা চড়াই পাখির মতোন। ডেঙ্গুজ্বর কালাজ্বর ম্যালেরিয়া সব জ্বরই ওই দেশে আসল রাজা। মরণ-বাঁচন কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। রাইতের বেলা পাহাড় থাইকা মহিষ নামে হরিণ নামে হাতি নামে। ক্ষেতের ফসল ব্যাবাক সাফ কইরা ফেলায়। হাতির পায়ের নিচে ঘরদুয়ার ভাইঙা তছনছ হয়। একেকটা জোঁকের সাইজ ধরো আধা হাত। রক্ত চুইষা খায় তিন পোয়া। বিরান পাথার। পাঁচ-সাত মাইল পরপর বসতি। তাও হাতে গুণা। এমন দেশে গিয়া খড়ের ছাউনি দিয়া ঘর বাইন্ধলাম। মবলগে খরচ এক টাকা চইদ্দ আনা।

হাজি দানেশ এসে এই আড্ডায় যোগ দেন।

মাওলানা ভাসানী বলে চলেন, আসামে পরথম আসছিলাম কোনো রাজনীতি করতে না, সামাজিক মিশন লইয়াও না। পীরের সাথে তালেবে এলেম হইয়া আসছিলাম। পীরের বোচকা-বাচকি বওয়া, ফুট-ফরমাস খাটা, আর প্যাটটা ভইরা দাওয়াত জিয়াফত খাওয়া—এই আছিল কাম। পীর ভাইদের সাথে মিইশা দেখলাম, আখেরাতের সুখ বহুত দূর। ইহকালের দোযখের জ্বালাই বড়োই নজদিক। রোজ দোযখের জ্বালা। লাইন প্রথা আর বঙ্গাল খেদার জ্বালায় হাজার হাজার বনি আদমের ঘর-সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে। তাই আমার নজর পরকালের তরিকার চায়া ইহকালের বাঁইচা থাকার ওপরেই পড়ল বেশি। লাইন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করলাম। বঙ্গাল খেদার বিরুদ্ধে আন্দোলন করলাম। মোল্লা মানুষ হইলাম রাজনীতির মানুষ। ধুবড়ির ভাসানে গিয়া ভাষণ দিছিলাম, আসামের লোক আমার নাম দিল মওলানা ভাসানী।'

এরই মধ্যে হাজি দানেশের সঙ্গে মওলানা ভাসানীর খুব খাতির হয়েছে।

হাজি দানেশ কমিউনিস্ট, আর ভাসানী গরিব মানুষ ভূমিহীন মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেন। যদিও ইসলামের প্রতি তার আস্থা অগাধ। পীর হিসাবে গ্রামে-গঞ্জে মানুষকে পানি-পড়া দেন।

ভাসানী বলেন, হাজি সাহেব, এইবার ছাড়া পাইলে আমরা একসাথে রাজনীতি করুম।

হাজি দানেশ বলেন, মওলানা সাহেব, আপনার সাথে আমাদের মিলবে না। আমরা তো আসলে সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাস করি।

মওলানা ভাসানী বলেন, আমরা ইলেকশনে সব কিষাণ মজুর গরিব মানুষরে নমিনেশন দিব। তাইলে তো অ্যাসেমব্লিতে গরিব মানুষই আইন বানাইব।

আপনি তো কৃষক শ্রমিক প্রতিনিধি পাঠিয়ে আইন পাস করলেন। কিন্তু এক্সিকিউশন করবে কে ? সব আমলাই তো একই রকম।

ভাসানী বলে, তাইলে কি আমগোরেও সশস্ত্র লাইন নিতে হইব ? মজিবর কী কও ?

শেখ মুজিব বলেন, আপনি যা বলেন হুজুর। আপনি হইলেন আমাদের পার্টির সভাপতি।

না আমি একলা সিদ্ধান্ত দিব নাকি।

এরপরে তারা পরিকল্পনা করেন কীভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম করা যায় খাজা-লিয়াকত মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে। তারা নানা স্বপ্ন বুনে চলেন।

তাদের পার্টির সদর দপ্তর হবে মধুপুরের জঙ্গলে। ওখানেই অস্ত্রের প্রশিক্ষণ হবে। শেখ মুজিবের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

চীনে কমিউনিস্ট পার্টির নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। তাদের সামনে একমাত্র বাধা কুওমিনতাং বাহিনী। একদিন ভাসানী খবর পেলেন, কুওমিনতাং বাহিনীও পরাজিত হয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি হাজি দানেশকে ডেকে নিলেন দোতলায়। তার মুখে হাসি—হাজি সাহেব, কমিউনিজম তো আইসা গেল। বাড়ির পাশে চীন পর্যন্ত আইছে।

হাজি দানেশের মুখেও হাসি। তিনি বললেন, তাহলে তো আপনার দাড়ি কামাতে হবে।

ভাসানী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কামাইতে হইলে হইব। মানুষ তো খাইতে পারব। পরতে পারব। হাজি সাহেব, শোনেন, আমার ইসলাম যদি সত্য হয়, তাইলে হাজারটা কমিউনিস্টও ইসলামরে ঠেকায়া রাখতে পারব না।

শেখ মুজিব চিঠি লিখতে বসেছেন। ফরিদপুর কারাগারে এখন তিনি। কনকনে শীত পড়েছে। ১৯৫০-এর ডিসেম্বর। সূর্যের আলো যেন কারাগারে ঢুকতেই পারছে না। কুয়াশাও খুব বেশি।

মুজিব জেলখানায় উবু হয়ে বসে চিঠি লিখছেন তার নেতা সোহরাওয়ার্দীকে।

এর মধ্যে একটা মামলায় তার তিনমাসের কারাবাসের শাস্তি হয়েছিল। সেই শাস্তির মেয়াদ দিন দশ আগে পেরিয়েও গেছে। তাকে মুক্তি দেওয়া হয় নি। বরং গোপালগঞ্জের আরেকটা মামলার জন্যে গোপালগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

গোপালগঞ্জে তার সঙ্গে দেখা করতে রেনু এসেছিলেন। আব্বা তো ছিলেনই। আর ছিল তার দুই ছেলেমেয়ে, তিন বছরের হাসু, আর এক বছরের কামাল। টুঙ্গিপাড়া থেকে নৌকায় এসেছিল তারা। গোপালগঞ্জে তাদের বাসা, আদালতপাড়াতেই।

আদালতেই মাকে দেখলেন মুজিব। মা তার মাথায় হাতও দিলেন।

রেনু ছেলেমেয়ে দুটোকে টেনে কাছে আনলেন তাদের বাবার। হাসিনা তাকে যেন লজ্জা পাচ্ছে। তিনি বললেন, কী রে হাসু, কাছে আয়। হাসিনা কাছে এলো। মাশাল্লাহ মা, বড় হয়ে গেছ। চুলও তো অনেক লম্বা হলো।

হাসু বলল, আরও বড় হতো। মা কেটে দিছল!

কামালকে এক কোলে, আর হাসুকে আরেক কোলে নিলেন মুজিব।

ঠিকমতো কথা কি আর বলা যায় কারও সঙ্গে ?

তাকে দেখতে ভিড় হয়ে গেছে পুরো গোপাল-গঞ্জের আদালতপাড়ায়। পুরো গোপালগঞ্জই যেন ভেঙে পড়ছে তাকে দেখতে।

পুলিশ কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। ভিড়ের মধ্যে আর রেনুর সঙ্গে ভালো

করে কথা হলো না।

মুজিব বললেন, রেনু, শক্ত থেকো। আমি তো এই জালিম সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালায়াই যাব।

রেনু চোখ তুলে বললেন, আমি শক্তই আছি। তুমি তোমার শরীর স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাইখো।

এরই মধ্যে পুলিশের বাঁশি। তার আওয়ামী মুসলিম লীগের থানা কমিটি, মহকুমা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি—সব চলে আসতে চাইছে তাকে দেখতে।

এই অবস্থায় শুনানিই বা হবে কী করে! সরকারি উকিল বললেন, তারা প্রস্তুত নন আজকে। তারিখ পেছানো হোক। তারিখ পেছানো হয়েছে।

গোপালগঞ্জ উপকারাগারে স্থান সংকুলান হবে না। তাই তাকে নিয়ে আসা হয়েছে ফরিদপুর কারাগারে।

মুজিব লিখে চলেছেন, ইংরেজিতে:

শেখ মুজিবুর রহমান
নিরাপত্তা বন্দি,
জেলা কারাগার,
ফরিদপুর,
পূর্ব বাংলা।
২১/১২/ ৫০

এই পর্যন্ত লিখে মুজিব পূর্ব বাংলা শব্দ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাংলা শব্দটা দেখলেই তার বুকটা ভরে ওঠে। তিনি কখনো পূর্ব পাকিস্তান কথাটা বলেনও না, লেখেনও না।

জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেব,

আপনার প্রতি আমার ছালাম। জেনে খুশি হয়েছি যে, মাওলানা সাহেব কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তিনি উচ্চ রক্তচাপ আর হৃদরোগে ভুগছিলেন। গত নভেম্বরে আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে হাজিরা দেওয়ার জন্যে গোপালগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে আমাকে আবার ফরিদপুর জেলে আনা হয়েছে, কারণ গোপালগঞ্জে নিরাপত্তাবন্দিদের জন্যে কোনো ব্যবস্থা নাই। আমাকে গোপালগঞ্জের আদালতে সব হাজিরা দিতে যেতে হয় ফরিদপুর কারাগার থেকে। ফরিদপুর থেকে গোপালগঞ্জ একবার যেতেই ৬০ ঘণ্টা লেগে যায়। যে পথ আর যে বাহনে যেতে হয় তা যার পর নাই ক্লান্তিকর। আমি জানি না এই মামলা কতদিন চলবে। যাই হোক না কেন, আমি এইসবকে পাত্তা দেই না। জনাব আবদুস সালাম খান আমাকে দেখতে ফরিদপুর কারাগারে এসেছিলেন। তিনি আমার হেবিয়াস করপাস মামলা পরিচালনা করবেন হাইকোর্টে। গোপালগঞ্জের মামলায় সালাম সাহেবও একজন আসামি। এটা পাকিস্তানের ইতিহাসে একমাত্র ঘটনা, যেখানে পুলিশ মসজিদের মধ্যে ঢুকে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে পিটিয়েছিল। দয়া করে আমার জন্যে ভাববেন না। আমি জানি, যারা মহৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য মরণকেই বেছে নেয়, তাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। বড় জিনিস অর্জিত হয় বড় আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। আল্লাহ যে কোনো কারো চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান, আর আমি তাঁর কাছেই কেবল ন্যায়বিচার চাই।

এই পর্যন্ত লিখে মুজিব একটু থামেন। এই কথাগুলো কেবল কথার কথা নয়। এগুলো তার মনের কথা। তিনি সত্যি বিশ্বাস করেন, নিজের জীবনটাকে তিনি দেশের জন্যে, দেশের মানুষের জন্যে, আদর্শের জন্যে বিলিয়ে দিতে পারেন। মরতে তিনি ভয় পান না। আর এও বিশ্বাস করেন, মহৎ আদর্শ অর্জনের জন্যে যে মরতে প্রস্তুত, তার বিজয়ও অবশ্যম্ভাবী।

একদিন বিজয়ী হবেন তিনি, তার বিজয় মানে তার একার বিজয় নয়, সবাইকে নিয়ে, পূর্ব বাংলার সবার বিজয়, কী এক স্বপ্নদৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেটা যে ঠিক কী, তিনি ধরতে পারেন না। এক ধরনের ভালো লাগায় তার হৃদয় আচ্ছন্ন হয়। চোখের কোণে জল আসে।

তিনি চশমা খোলেন। সোনালি ফ্রেমের চশমা। তিনি তার ফুলহাতা শার্টটা দিয়ে চোখের জল মোছেন।

আবার তিনি লিখতে থাকেন—

আপনার দিনকাল কেমন যাচ্ছে? আমি অনুভব করতে পারি, আপনি খুবই ব্যস্ত। দয়া করে মওলানা নিয়াজি, জনাব গোলাম মোহাম্মদ খান, নওয়াবজাদা জুলফিকার আর আমার অন্য বন্ধুদের আমার সালাম জানাবেন। আমি সব সময়ই তাদের ভালোবাসা ও স্নেহের কথা স্মরণ করি। তাদেরকে বলবেন, যদি আবার কখনও সুযোগ পাই, আমি অবশ্যই তাদের সঙ্গে দেখা করতে লাহোর যাব।

গত অক্টোবরে যখন আপনার সঙ্গে আমার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকে দেখা হয়েছিল, আপনি দয়া করে কথা দিয়েছিলেন, আমার জন্যে কিছু বই পাঠাবেন। আমি এখন পর্যন্ত কোনো বই পাই নাই। আপনার ভুলে গেলে চলবে না যে, আমি একা আর বইপুস্তকই হচ্ছে আমার একমাত্র সঙ্গী। যাই হোক, আমার দিন চলে যাচ্ছে। দয়া করে শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন।

ইতি আপনার স্নেহের
মুজিবুর

তিনি এই চিঠিটা ডাকে ফেলার জন্যে জেল কর্তৃপক্ষকে দিলেন।

তাকে না জানিয়ে কারা কতৃপক্ষ সেটা গোয়েন্দাদের হাতে দিয়ে দিল আর চিঠিটা চিরদিনের জন্যে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

মুজিবের শরীরটা ভালো নয়। কাশির গমক উঠছে। বুকে মনে হয় ইনফেকশন হয়েছে। একবার ফরিদপুর থেকে গোপালগঞ্জ যেতে লাগে ৬০ ঘণ্টা। আড়াই দিন। ফিরতে লাগে আরও আড়াই দিন।

মুজিব এরই মধ্যে পূর্ব বাংলার ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলকে চিঠি লিখেছেন। বলেছেন, আমার প্রতি আর আমার মামলাটার প্রতি সুবিচার করতে হলে একটা কাজ করুন—শাস্তির মেয়াদ যেদিন শেষ হবে, মানে ১৯৫০ সালের ১১ ডিসেম্বর, সেদিন আমাকে হয় মুক্তি দিন। মুক্তি যদি দেওয়া না যায়, তাহলে আমাকে গোপালগঞ্জ থানা চত্বরেই আটক করে রাখুন। এই দুটো বিকল্পের একটাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আমাকে খুলনা নয়তো বরিশাল জেলে পাঠিয়ে দিন, যেখান থেকে গোপালগঞ্জ যাওয়া-আসাটা সহজতর।

এই তিনটা বিকল্পের তিন নম্বরটা সরকারের পছন্দ হয়েছে। মুজিবকে খুলনা কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

খুলনা কারাগারে মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে আসেন গোয়েন্দাবাহিনীর এক সদস্য।

তিনি তাকে বলেন, শেখ সাহেব, আপনাকে আমরা মুক্তি দেব। আপনার শরীরটা ভালো না। বুকে কফ জমে গেছে দেখতে পাচ্ছি। কাশি দিচ্ছেন। আপনি কেন কষ্ট করছেন? আপনি এক কাজ করেন। এই কাগজটাতে একটা সাইন করেন। তারপরই আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মুজিবের মুখ কঠিন হয়ে যায়। তিনি একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেন, এই কাগজটা কী আমি জানি। এটা একটা মুচলেকা। আমি আর কোনোদিনও পাকিস্তানের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিব না। শোনেন সাহেব, আমার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। বস্ত দিয়ে আমি শেখ মুজিবুর রহমান নুরুল আমীনের

কাছে মুক্তি চাই না। বন্ডে সাইন করতে রাজি হলে তো আমাকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকেই বার করে দিতে পারত না। বন্ডে সাইন করতে রাজি হলে আমি অনেক আগেই ছাড়া পেতাম।

না মানে শেখ সাহেব। সবাই তো বন্ডে সাইন করেই মুক্তি পাচ্ছে। আপনি একা কেন কষ্ট করবেন। মাওলানা ভাসানী সাহেব বাইরে, শামসুল হক সাহেব বাইরে।

আমি জানি। ভাসানী মাওলানা বন্ডে সাইন করে মুক্তি নেবেন, এটা আমি কল্পনাও করি না। আমিও বন্ড দিব না। শোনেন। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আমাকে ডিটেনশন দিয়ে যদি মেরেও ফেলেন, তবু আমি বন্ড দিয়ে মুক্তি নেব না। কারণ আমি মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছি। কোন মানুষ, পূর্ব বাংলার গরিব মেহনতি মানুষ। যাদের ত্যাগের মধ্য দিয়ে এই পাকিস্তান সম্ভব হয়েছে।

শোনেন, এই পাকিস্তানের জন্যে পূর্ব বাংলার মানুষ সংগ্রাম করেছে। তারা ভোট দিয়েছে বলে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল ইলেকশনে। সেই ইলেকশনে আমি প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছি। আমার নেতা সোহরাওয়ার্দী সাহেব করেছেন। মাওলানা ভাসানী না থাকলে সিলেটে জিততে পারতাম আমরা? এই বাংলার গরিব-দুখী মানুষ পাকিস্তান এনেছে, আর অযোগ্য মুসলিম লীগ সরকার এই গরিব মানুষকে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আমি সেই গরিব মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সংগ্রাম করছি।

আর সংবিধানের মৌলিক নীতি কমিটির রিপোর্ট যেটা জমা দেওয়া হয়েছে এটা কী? এটা তো পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তা ব্যক্তিরা বাংলাকে তাদের কলোনি বানাতে চায়। এটা আমরা মানব না।

পাঞ্জাবে নির্বাচন হচ্ছে। ওই নির্বাচনে মুসলিম লীগ অল্প মার্জিনে জিতে যাবে। কিন্তু সাহস থাকে তো বাংলায় নির্বাচন দিতে বলেন। আমরা আওয়ামী মুসলিম লীগ একতরফাভাবে জিতে যাব। মুসলিম লীগের ভরাডুবি হবে। আদৌ যদি পূর্ব বাংলায় নির্বাচন হয়।

যান আপনার নুরুল আমীন খাজাকে বলে দেন মুজিবুর রহমান এইসব কথা বলেছে। লিখে দেন। আর ওই বন্ডের কাগজ আমার চোখের ত্রিসীমানাতেও আনার চেষ্টা করবেন না। যান।

গোয়েন্দা সদস্যটি, তার বয়স ৪০-এর কোটায়, চুল ছোট করে ছাঁটা, গাল বসানো, মুজিবকে বললেন, আপনি কি বুঝছেন আপনার এইসব কথা আমাকে লিখে উপরওয়ালাকে জানাতে হবে।

বললাম তো নুরুল আমীনকে জানান। খাজাকে জানান। অন্যায় করে অত্যাচার করে আওয়ামী লীগের হাজার হাজার কর্মীর ওপরে অত্যাচার করে তারা গদিতে থাকতে পারবে না। বাংলার মানুষের মুক্তি আমি আদায় করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।

গোয়েন্দা সদস্যটি বিদায় নিয়ে চলে যান। তাড়াতাড়ি নিজের অফিসে গিয়ে বসেন। ভুলে যাওয়ার আগেই পুরো আলোচনাটা তাকে লিখে ফেলতে হবে। তিনি লিখতে শুরু করেন, আই ইন্টারভিউড দি সিকিউরিটি প্রিজনার শেখ মুজিবুর রহমান ইন খুলনা জেইল অন ২২-২-৫১। তিনি পুরো কথোপকথনটার একটা সংক্ষেপিত কিন্তু স্পষ্ট বর্ণনা লেখেন দক্ষতার সঙ্গে। তার রিপোর্টের শেষ দুটো লাইন হলো: 'হি ওয়াজ নট উইলিং টু এক্সিকিউট এনি বন্ড ফর হিজ রিলিজ ইভেন ইফ দি ডিটেনশন উড কজ হিম টু ফেইস ডেথ। হিজ এটিচুড ওয়াজ ভেরি স্টিফ।'

এরপর শেখ মুজিবকে কী করা হবে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, পুলিশ, গভর্নর অফিস, কারাগার কর্তৃপক্ষ তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। একবার নির্দেশ আসে তাকে অবিলম্বে খুলনা থেকে বরিশাল কারাগারে নেওয়া হোক। তারপর বলা হয়, তাকে ছেড়ে দিয়ে আবার গ্রেপ্তার করা হোক।

চৈত্র মাসে তাকে ফরিদপুর জেলা কারাগারে নিয়ে গিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়। তাকে কারাগারের ফটকে বরণ করে নিতে ভিড় জমে যায়। তিনি সেখানেই সমবেত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিতে শুরু করেন।

তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র যুবকেরা মিছিল বের করে, ফরিদপুরের পথেঘাটে জনতা আওয়াজ তোলে 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই'। গোপালগঞ্জে পরের দিন হরতাল পালিত হয়।

গোয়েন্দা কর্মকর্তার পাঠানো প্রতিবেদন, আর তার সঙ্গে শেখ মুজিবের আগের কার্যকলাপের সকল গোয়েন্দা প্রতিবেদন মিলিয়ে দেখেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, তারপর 'যেহেতু এই বন্দির মনোভাব অনড়, এবং যেহেতু ভবিষ্যতেও তিনি আরও অপকর্ম ঘটানোর সম্ভাবনা ধারণ করেন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তার ডিটেনশন বা আটকাদেশ আরও ছয়মাসের জন্যে বাড়িয়ে দেওয়ার সুপারিশ করছেন।'

গোয়েন্দা বিভাগের ডিআইজি তাই চূড়ান্ত সুপারিশ করেন, 'আমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে একমত পোষণ করি এবং সুপারিশ করছি, এই বন্দির আটকাদেশ নিরাপত্তা আইনে আরও ছয়মাস বৃদ্ধি করা হোক।' মোঃ এ, খালেক, ডিআইজি, আইবি, ২৮-৩-৫১।

গভর্নর সেই আদেশই দান করেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে মুজিবের কাছে মুচলেকা আদায়ের জন্যে গিয়েছিলে গোয়েন্দা সদস্য, সেটা ছিল খুলনা কারাগারে।

মে মাসের ২২ তারিখে ফরিদপুর কারাগারে আসেন আরেক গোয়েন্দা কর্তা। উদ্দেশ্য শেখ মুজিবকে মুচলেকায় স্বাক্ষর দেওয়ানো, তাকে সরকারের কাছে নতি স্বীকার করানো, তাকে নমনীয় করা।

গোয়েন্দা সদস্য তাকে বলেন, শেখ সাহেব, ভাসানী মুক্তি পেলেন, শামসুল হক মুক্তি পেলেন। আপনি কি মুক্তি চান না?

শেখ মুজিব বলেন, অবশ্যই মুক্তি চাই। আমার পার্টির প্রেসিডেন্টকে সরকার মুক্তি দিল, সাধারণ সম্পাদককে মুক্তি দিল, আমি তো তিন নম্বর লোক, সাধারণ সম্পাদক, আমাকে কেন মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না আমি বুঝছি না।

আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনি বন্ড সই করেন। বলেন, এই ধরনের সরকারবিরোধী রাষ্ট্রবিরোধী কাজে আপনি আর জড়িত হবেন না। আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

মুজিব বলেন, অসম্ভব। বন্ড দিয়ে আমি মুক্তি নেব না।

আপনি যা করেছেন, তার জন্য কি আপনি অনুতপ্ত নন?

মোটেও না। আমি যা করেছি বাংলার মানুষের ভালোর জন্যে করেছি। প্রতিটা দেশপ্রেমিক মানুষের এখন এই সরকারের বিরুদ্ধে পথে নামাটাই কর্তব্য।

আপনি কি মুক্তি পেলে এইসব রাষ্ট্রবিরোধী কাজ থেকে সরে দাঁড়াবেন?

মোটেও না। আমি আমার কাজ চালায়া যাব।

আপনার পরবর্তী কর্মসূচি কী?

সেটা আমি আপনাকে বলব না।

মাওলানা ভাসানীকে ছাড়া হয়েছে। শামসুল হককে ছাড়া হয়েছে। আপনাকেও তো ছাড়া হবে। আপনি বলেন আপনি ভুল করেছেন।

আমি এটা বলব না। আমার যা হয় হবে। দেশের জন্যে আমি নিজেকে কুরবানি করে দিয়েছি।

মে মাসের ২২-এর পরে জুলাইয়ের ১৪। আবারও ফরিদপুর জেলে ডিআইবি পুলিশ শেখ মুজিবের কাছে যায়। তাকে একই প্রকারে মুক্তির প্রলোভন দেখানো হয়। কিন্তু মুজিব মুসলিম সরকারের তীব্র সমালোচনা করা, জেল থেকে মুক্তি পেলে আরও সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করার কথা বলা থেকে বিরত থাকলেন না। মুচলেকা দিতে বরাবরের মতোই অস্বীকৃতি জানালেন।

আর বরাবরের মতোই কর্মকর্তারা, সে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই হোক, আর ডিআইবির উপ মহাপরিচালকই হোক, তার আটকাদেশের মেয়াদ আরও ছয়মাস বাড়িয়ে দেওয়ার সুপারিশ করেন।

এইভাবে অন্তত ছয়বার মুজিবের কাছে যান গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা। তাকে নোয়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু মুজিব অনমনীয়। তিনি ভাঙবেন। তবু মচকাবেন না। তিনি মুচলেকায় স্বাক্ষর করলেনই না। মুক্তি তাকে দেওয়াও হচ্ছে না। আর তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের নব্য উপনিবেশের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তব্য দেওয়াও বন্ধ করলেন না। প্রত্যেকবার কর্তৃপক্ষ তার আটকাদেশের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানোর জন্যেই সুপারিশ করলেন।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সী যুবক তাজউদ্দীন আজ ভেতরে ভেতরে কিছুটা উত্তেজিত। ভোর সাড়ে ৫টায় ঘুম থেকে উঠেছেন তিনি। অথচ এত ভোরে না উঠলেও চলত। আজ ১১ মার্চ, আজকে রাষ্ট্রভাষা দিবস। আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ এই দিনে ছাত্র-জনতা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট ডেকেছিল, মিছিলে ব্যারিকেডে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, আর তারওপরে আক্রমণ চালিয়েছিল খাজা নাজিম উদ্দিনের পুলিশ বাহিনী। সেই দিনটাকে আবার বিশেষভাবে স্মরণ করা দরকার।

১৯৪৯ সালে দিনটা তেমন করে পালিত হতে পারে নি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে আন্দোলন চলছিল তখন। ১৯৫০ সালে এই সময়টাতে চলছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কলকাতার দাঙ্গার ঢেউ আছড়ে পড়ে ঢাকায়। তারপর ঢাকার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে, গ্রামেগঞ্জে।

ফজলুল হক হলের কমনরুমে পত্রিকা পড়তে পড়তে তাজউদ্দীন সেইসব কথাই ভাবছিলেন। ঢাকায় যারা অবাঙালি শরণার্থী এসেছিলেন, দাঙ্গায় তাদের উৎসাহ ছিল বেশি, কারণ ঢাকায় থাকার মতো বাড়িঘর পাওয়া যাচ্ছিল না, এমনকি বাসা ভাড়াও পাওয়া যায় না। হিন্দু পরিবার বিতাড়ন করে তারা সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছিল। সারা দেশেও একই কারণে দাঙ্গা তথা গুণ্ডামি ছড়িয়ে পড়ল। হিন্দুদের জোতজমি হালের গরু দখল করার এটা ছিল একটা মোক্ষম উপলক্ষ।

এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, বা ১৫০ মোগলটুলিকেন্দ্রিক ছাত্রযুবারা আগে থেকেই সচেষ্ট আর সচেতন। তারা এবার ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করবে।

আজকের পত্রিকায় পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কিছু উত্তেজনাকর খবর আছে। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, যিনি আবার প্রতিরক্ষামন্ত্রীও, নির্দেশ দিয়েছেন, মেজর আকবর খান, ব্রিগেডিয়ার লতিফ, মিসেস আকবর খান, *পাকিস্তান টাইমসের* সম্পাদক কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুদিন আগে। আজ খবরের কাগজে আছে সেই খবরটা।

সামনে যুব কনভেনশন। তোয়াহা সাহেব, অলি আহাদ প্রমুখের সঙ্গে তাজউদ্দীনও এই যুব সম্মেলন সংগঠিত করার জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন। গত রাতেও তারা পশ্চিম ব্যারাকে গিয়ে যুব সম্মেলনের জন্যে চাঁদা তুলেছেন। কাল রাতে শুতে শুতে তাই সোয়া এগারোটা বেজে গিয়েছিল।

সামনে পরীক্ষাও। প্রবেশপত্র তুলেছেন গতকাল, হল অফিস থেকে। খবরের কাগজ পড়ে নিজের রুমে এলেন তাজউদ্দীন। পরীক্ষার পড়া খানিকটা পড়ে রাখা ভালো। সামনের দিনগুলোয় তার কাজ আরও বাড়বে। রাজনীতির কাজ। পড়াশোনা যতটা পারা যায় এগিয়ে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। অর্থনীতি নিয়ে পড়ছেন তিনি। তার রুমমেট মোজাফফর আলীও অর্থনীতি নিয়েই পড়ছেন।

রুমমেট একই বিষয়ের ছাত্র হওয়ায় তাজউদ্দীন আহমদের সুবিধা হয়েছে। তিনি নিজে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন রাজনীতি নিয়ে। আজকাল অবশ্য তার নিজের এলাকা কাপাসিয়ার বন বিভাগের সঙ্গে কী একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন। বন বিভাগের কর্মচারীরা যেসব অপকর্ম দুর্নীতি করে, তাজউদ্দীন তার প্রতিবাদ করছেন। তাদেরকে ধরিয়ে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে ফন্দিফিকির করছেন। প্রায়ই তাকে বন বিভাগের ঢাকা অফিসের উচ্চতর কর্মকর্তাদের কাছে যেতে হচ্ছে।

রুমমেট মোজাফফর আলীর পারিবারিক অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়। বলা যায় তিনি একজন সহায়-সম্বলহীন মানুষ। টিউশনি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চালান। উল্টো তাকে গ্রামে টাকা পাঠাতে হয়। তাজউদ্দীন আহমদ নিজেই গিয়ে দেখা করলেন প্রভোস্ট ড. এম এন হুদার সঙ্গে। তাজউদ্দীনকে অবশ্য প্রভোস্ট এম এন হুদা কিংবা হাউজ টিউটর বি. করিম খুবই পছন্দ করেন। ছেলেটা কথা বলে কম, কিন্তু কাজ করে যায় নীরবে, বোঝা যায় চিন্তাভাবনা করে পথ চলে। তিনি যে ছাত্রনেতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য সেটা এই শিক্ষকেরা বোঝেন এবং তার কথাকে মূল্য দেন।

তাজউদ্দীন বললেন এম এন হুদাকে, স্যার, মোজাফফর আলীর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড একটু বিবেচনা করতে হবে। ওর ইকোনোমিক অবস্থা তো খুবই খারাপ। টিউশনি করে টাকা আয় করে। আবার বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয়। গত মাসে তো যা টিউশনি করে পেল, তার চেয়ে বেশি টাকা তাকে বাড়িতে পাঠাতে হয়েছে। আমাদের কাছে ধারকর্জ করতে হচ্ছে তাকে। আপনি স্যার ওর হলের ডাইনিং চার্জটা যদি মওকুফ করে দিতেন।

এম এন হুদা তাকালেন তাজউদ্দীনের দিকে। ছেলেটার চোখ উজ্জ্বল। কিন্তু চশমা ঢাকা চোখে মুখে পড়াশোনার ছাপ। আজকালকার ছাত্রনেতারা সাধারণত অদ্ভুত অদ্ভুত দাবি-দাওয়া নিয়ে আসে। এই ছেলেটা এসেছে তার রুমমেটের জন্য।

তিনি বললেন, তুমি এক কাজ করো। মোজাফফরকে বলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। একটা পিটিশন করতে হবে। আমি ওর সাথে কথা বলে নিচ্ছি।

তাজউদ্দীন এসে বললেন মোজাফফরকে, আপনি প্রভোস্টের সঙ্গে দেখা করেন। আমি তার সাথে কথা বলে এসেছি। আপনি গেলেই হবে।

মোজাফফর আলী নিয়মিত ক্লাস করেন। সুন্দর করে নোট তুলে রাখেন। রাত নটা দশটার দিকে তাজউদ্দীন হলে ফিরে এসে মোজাফফরকে বলেন, কী কী পড়লেন একটু বোঝান দেখি।

মোজাফফর যা পড়েছেন, তা থেকে যা বুঝেছেন, তাই বিবৃত করেন। তাজউদ্দীন মন দিয়ে শোনেন। মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করেন। এইভাবে রাত ১১টা/ ১২টা পর্যন্ত এক সঙ্গে পড়াশোনা করেন দুজন। পড়াশোনা কথাটা তাদের দুজনের বেলায় আক্ষরিক অর্থেই সত্য, মোজাফফর পড়েন, তাজউদ্দীন শোনেন।

আজকে মোজাফফর বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু ক্লাস হবে না, রাষ্ট্রভাষা দিবসের ধর্মঘট, আমি একটু যাই। টিউশনিটা সারি। আমার ছাত্রের মেট্রিক পরীক্ষা। মোজাফফর চলে গেলেন।

নিজের পড়াটা একটু এগিয়ে নিলেন তাজউদ্দীন। অর্থনীতি পড়তে তার ভালো লাগে। তিনি অর্থনীতি বিষয়টা বেছে নিয়েছেন, কারণ তিনি জানেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে অর্থনীতিটাই চালিকাশক্তি। অর্থনীতিটা বুঝতে হবে। তাহলেই দেশের মানুষের মুক্তির জন্যে কী ধরনের রাজনীতি দরকার, সেটা বোঝা যাবে।

কুহু কুহু। কোকিলের ডাক শোনা যাচ্ছে। বসন্ত কাল। জানালা দিয়ে বসন্তের বিখ্যাত দখিনা বাতাসও এসে ঢুকে পড়ছে ঘরে।

তাজউদ্দীনের একটুখানি উদাসমতো লাগে। এমনিতেই প্রচণ্ড গরম। শরীর ঘর্মাক্ত। এর মধ্যে এই বাতাসটা এসে যখন শরীরে ঝাপ্টা দেয়, খুবই আরাম লাগে।

নাহ। ওঠা যাক। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যাওয়া যাক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রসভা। আমগাছের ছায়ায় সমবেত হয়েছে ছাত্ররা। বসন্তের বাতাসে পাতারা নড়ছে। নড়ছে ছায়াও। তবুও প্রচণ্ড গরম, সেটা মানতেই হবে। ছাত্রদের অবশ্য গরম-ঠান্ডা এইসব দিকে মোটেও খেয়াল নাই।

সভাপতিত্ব করলেন মুসলিম ছাত্রলীগের খালেক নেওয়াজ খান। হাবিবুর রহমান শেলি, বদিউর রহমান, মোহাম্মদ আলী বক্তৃতা করলেন। তাজউদ্দীন একটু মুখচোরা স্বভাবের। তিনি এসব সভায় বক্তৃতা করেন না সাধারণত।

বক্তাদের বক্তব্য বিষয় মোটামুটি এই রকম: ১৯৪৮ সালে খাজা নাজিম উদ্দীনের সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে যে একটা চুক্তি হয়েছে, সেটা কেন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না ? নুরুল আমীন সরকার যদি এই চুক্তি বাস্তবায়ন না করার কথা ভাবে, তাহলে তার পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদেরকেও ইতিহাস ক্ষমা করবে না। আর সারাদেশে যে অরাজকতা চলছে, দেশের মানুষ যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছে, আর রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠা না করে আরবি অক্ষরে বাংলা লেখানোর যে অপপ্রয়াস চলছে, এসবের জন্যে দায়ী অযোগ্য মুসলিম লীগ সরকার। তার প্রতিবাদে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সকল সদস্যের উচিত একযোগ পদত্যাগ করা।

আবদুল মতিন এক কোণে সভার শ্রোতাদের ভিড়ের মধ্যে বসে ছাত্রনেতাদের

ভাষণ শুনছেন। তার কোনো ভাষণই ভালো লাগছে না। তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। মাননীয় সভাপতি, আমি কিছু বলতে চাই।

সভাপদি আবদুল মতিনকে কথা বলার অনুমতি দিলেন।

আবদুল মতিন বলতে লাগলেন, শোনেন, কিছুদিন আগে ফজলুল হক হলের পশ্চিম-দক্ষিণ ব্যারাকে চায়ের দোকানে বসে ছিলাম। আমার পাশে টুলে বসে আছেন দু'ব্যক্তি, কথাবার্তা শুনে বেশভূষা দেখে আমি বুঝতে পারলাম তারা সচিবালয়ের কর্মচারী। তাদের একজন আরেকজনকে বলছে, 'ছাত্রদের আন্দোলন থেমে গেল। বাংলা আর রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে না, উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হয়ে যাবে। আমরা উর্দু পড়তে পারি না। লিখতে পারি না। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে আমাদের তো খুব অসুবিধা হবে। কী আর করি। আমরা চাকরি করে খাই। আমরা তো আর আন্দোলন করতে পারব না। আন্দোলন করতে গেলে আমাদের চাকরি চলে যাবে। আন্দোলনে নামা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ছাত্ররা ছিল আশা-ভরসা। তারাও ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

সত্যি কি আমরা ঠান্ডা হয়ে যাই নি। মাননীয় সভাপতি, এইভাবে সভা করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা যাবে? আপনারা যা কিছু করছেন সবই তো আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এতে কোনো কাজ হবে না। যদি বাংলা ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তবে রাস্তায় আন্দোলনে নামুন। আপনারা সংগঠন গড়ে তুলুন।

উপস্থিত ছাত্ররা বিপুল করতালিতে অভিনন্দিত করল এম এ মতিনের ভাষণ।

ছাত্ররা বলল, পরে নয়, এখনই একটা কমিটি করুন।

তখন একটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হলো। এম এ মতিনকেই আহ্বায়ক করা হোক, ছাত্ররা আওয়াজ তুলল। এম এ মতিনই আহ্বায়ক হলেন। তাজউদ্দীন আহমদকে ওই কমিটির একজন সদস্য রাখা হলো।

সভা শেষ হলে তাজউদ্দীন গেলেন মধু'র দোকানে। সেখানে গিয়ে দেখেন গণ্ডগোল বেধে গেছে। কেউ ক্লাস করছে না, এই অবস্থায় ৪জন ক্লাসে ছিল। এরা সবাই অবাঙালি। ৪ জনের মধ্যে আবার ৩জন বেরিয়ে এসেছে ক্লাস থেকে। কিন্তু জুবায়ের নামে একজন কিছুতেই ক্লাস থেকে বেরুবে না। সে আবার ড. শাদানির ভাগ্নে, তারই তেজ দেখাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন সেও এসেছে মধু'র চায়ের দোকানে।

ওয়াদুদ ক্ষেপে গেছে। সে জুবায়েরকে পারলে মারে। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হলো। জুবায়েরও চিৎকার করছে। ক্লাসে এসেছি ক্লাস করতে। আমগাছতলায় গিয়ে আড্ডা মারতে তো আসি নি। ধর্মঘট করা তোমাদের অধিকার। না করা আমার অধিকার। এবার সব বাঙালি ছেলে যদি জুবায়েরকে মারতে আরম্ভ করে ও তো ছাতু হয়ে যাবে। তাজউদ্দীন প্রমাদ গুনলেন। তাড়াতাড়ি তিনি দাঁড়ালেন দুপক্ষের মধ্যখানে। শিক্ষকরাও এলেন। একটা সম্ভাব্য খণ্ডযুদ্ধ এড়ানো গেল।

দুদিন পরে এই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির বৈঠক বসল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাজউদ্দীন যোগ দিলেন তাতে।

বসন্তের এই দিনগুলো এই রকমই যাচ্ছে তাজউদ্দীনের। আজ এ সভা, কাল ও সভা। মেডিকাল স্কুলের ছাত্ররা আন্দোলন করছে, তিনি ছুটে যাচ্ছেন সেখানে। আবার ফজলুল হকের বার্ষিক মিলাদ হবে, আবুল হাশিম সাহেব, কামরুদ্দিন আহমদ সাহেবকে অতিথি করে সেখানে আনার কাজটাও তিনি করছেন।

আবুল হাশিম সাহেব এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে চলে এসেছেন ঢাকায়। দাঙ্গার সময় তার বর্ধমানের বাড়িঘর ভস্মীভূত হয়েছে। ইদানীং তিনি পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও ফেলেছেন। পরিবার পরিজন নিয়ে বর্ধমান ছাড়েন তিনি। কলকাতায় এক সময় ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। কত তার ভক্ত অনুসারী ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পরে মুসলিম লীগাররা তো সব পূর্ববঙ্গে চলে এসেছে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির যারা তার ভক্ত ছিলেন তারাও কেউ তাকে আশ্রয় দিল না। আবার ফিরে গেলেন বর্ধমানে। এইখানে তাদের আছে বংশগত ঐতিহ্য। গ্রামের নাম ছিল কাশিয়ারা, আবুল হাশিমের বাবার নাম অনুসারে সেটা হয়েছে কাশিমনগর। গ্রামের গরিব প্রজারা বলল, কর্তা আপনি থেকে যান, আমরা থাকতে কেউ আপনার গায়ে হাত দিতে পারবে না। এই কথাতেই নাকি হাশিম সাহেব বেশি দুঃখ পেয়েছেন। এতদিন যাদেরকে তারা রক্ষা করে এসেছেন, এখন তারাই তাকে অভয়বাণী দিচ্ছে। তার সামন্ত অভিজাততান্ত্রিক মনে এটাই নাকি বেশি ব্যথা দিয়েছে।

আবুশ হাশিম সাহেব, কামরুদ্দিন সাহেব তো মিলাদে এসেছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও।

আবার একদিন দুপুরবেলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা। সভাপতিত্ব করলেন মুহম্মদ

হাবিবুর রহমান শেলি। খসড়া কমিটি একটা স্মারকলিপি পেশ করল। এই স্মারকলিপি সব এমএলএ আর এমসিএ-র কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাজউদ্দীন আহমদ হাতে নিলেন খসড়াটি। ইংরেজিতে রচিত:

সমীপেষু

.....

সদস্য, গণপরিষদ

করাচী, পাকিস্তান।

জনাব,

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যারা তিন বছর পূর্বে পূর্ব বাংলায় ভাষার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলাম তারা বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পূর্বের যে-কোনো সময়ের চেয়ে সেই লক্ষ্য অর্জনের বেশি দৃঢ়সংকল্প। আমরা সেইসব ছাত্র আপনাদের সকলের করাচীতে একত্র হওয়ার উপলক্ষকে সামনে রেখে আরো একবার আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণের জন্য আপনাদের তাগাদা দেব।

অনেক বড় হয়েছে স্মারকলিপিটি। আরেকটু ছোট হলে ভালো হতো, তাজউদ্দীন ভাবলেন। যাই হোক ছোটখাটো সংশোধনী শেষে খসড়াটা অনুমোদিত হলো।

পহেলা বৈশাখ পেরিয়ে গেল। বসন্তের বাতাস এখন পরিণত হচ্ছে কালবৈশাখীতে। গতকালও সারাদিন ধূলিঝড় হয়েছে। গরম খুব। আজকে অবশ্য বাতাস বইছে মৃদুমন্দ। কিন্তু গরম কমছে না।

তাজউদ্দীন ফজলুল হক হলের ৭৬ নম্বর রুমে বসে ঘামছেন। হাতে একটা কাগজ। সেটা নেড়ে নেড়ে তিনি বাতাস করছেন। রুমে আরও কয়েকজন উপস্থিত। আবারও বসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা। আজকে সভাপতিত্ব করছেন তাজউদ্দীন নিজে।

ইদানীং তাজউদ্দীন কথা বলতে শুরু করেছেন। একটু একটু করে সামনে আসছেন। যুব লীগের কমিটিতেও তাকে রাখা হয়েছে।

গত মাসে যুব সম্মেলনে এই কমিটি হয়। সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্যেও বেশ পরিশ্রম করেছেন তাজউদ্দীন।

সম্মেলন হওয়ার কথা বার লাইব্রেরি মিলনায়তনে। কিন্তু সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। মিটিং করা যাবে না। রাতের মধ্যে সবাইকে খবর দেওয়া হলো জিঞ্জিরা বাজারে আসার জন্যে। দুপুরে সভা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সন্ধ্যার পর সভা শুরু হয়। আসলে উদ্যোক্তারা পুলিশি হামলার আশঙ্কা করছিলেন। তাই তারা বিকল্প ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলেন। কনভেনশনের উদ্বোধন করলেন *ডেইলি অবজারভারের* সভাপতি আবদুস সালাম। সভাপতিত্ব করেন সিলেটের মাহমুদ আলী। তিনি যথারীতি শেরওয়ানি আর পায়জামা পরে এসেছেন। তিনি আসলে ভক্ত মাওলানা ভাসানীর। ভাসানী মুসলিম লীগ ছেড়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেছেন, মাহমুদ আলীও মুসলিম লীগ ছেড়ে দিয়েছেন।

পুলিশের লোকজন গিজগিজ করছে।

রাত দশটায় সভা থেকে বেরিয়ে প্রতিনিধিরা আলাদা আলাদা চারটা নৌকায় উঠল। পুলিশ কিছু বুঝতে পারল না। মাঝনদীতে গিয়ে চার নৌকা একত্রিত হলো। একসাথে বাঁধা হলো নৌকা চারটাকে। ১৪৪ ধারাকে ফাঁকি দিয়ে চাঁদের আলোর নিচে বুড়িগঙ্গা নদীতে ভাসতে ভাসতে অনুষ্ঠিত হলো যুবলীগের প্রতিনিধি সম্মেলন। রাত ১১টায় এই সম্মেলন শুরু হলো। একটা করে জাহাজ যায়। পানিতে ঢেউ ওঠে। নৌকা ওঠে দুলে। আলোচনার গাম্ভীর্য আর গুরুত্ব তাতে একটুখানি টলে না।

খসড়া গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হলো। মাহমুদ আলীকে সভাপতি, আর অলি আহাদকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠন করা হলো এর কমিটি। তাজউদ্দীনকেও রাখা হলো এই যুবলীগের কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে।

নৌকাগুলো ভাসতে ভাসতে চলে গেল অনেকটা ভাটিতে। আবার উজানপথে চলতে শুরু করল বোটগুলো। আলোচনাও চলতে লাগল উজানপথে পূর্ব বাংলার মানুষের দাবি-দাওয়াগুলোকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে তা নিয়ে।

রাত আড়াইটায় নৌকা ভিড়ল মিটফোর্ড ঘাটে। সহকর্মীদের সঙ্গে নেমে পড়লেন তাজউদ্দীনও। ঘোড়াগাড়ি করে এলেন ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে। চা খেলেন।

তারপর ফিরে এলেন হলে।

সে রাতে তাজউদ্দীনের আর কিছু খাওয়া হলো না। ভোরবেলা শুতে গেলেন।

সে রাতে তিনি হলেন যুবলীগের সদস্য, আজকে তিনি সভাপতিত্ব করছেন রাষ্ট্রভাষা কমিটির সভায়।

তাজউদ্দীনের মনে হচ্ছে, এর আগে যে স্মারকলিপি এমএলএ আর এমসিএদের পাঠানো হয়েছিল, সেটা বেশি বড় হয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের ব্যস্ত মানুষদের জন্যে স্পষ্ট কথা সংক্ষেপে পেশ করা ভালো। এর একটা সহজ উপায় আছে। তা হলো সবাইকে টেলিগ্রাম পাঠানো। তাতে আসল কথাটা তাদের কাছে দ্রুত গিয়ে পৌঁছাবে। টেলিগ্রাম বলে তারা ফেলেও দেবেন না, পড়ে দেখবেন।

এই প্রস্তাবই তিনি পেশ করলেন এই সভায়।

তার প্রস্তাব গৃহীত হলো।

টেলিগ্রামের একটা খসড়াও তৈরি করে ফেলা হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের ছাত্ররা আপনাদের কাছে জরুরি আবেদন জানাচ্ছে যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে শর্ট নোটিস প্রশ্ন উত্থাপন করুন।

টেলিগ্রামটা পাঠানোর দায়দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে সেদিনের মতো সভার কাজ শেষ হয়।

তাজউদ্দীন আহমদ ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে পৌঁছে দেখলেন, মাওলানা ভাসানী আগেই পৌঁছে গেছেন। ভোরবেলা। ৬টা ৫ মিনিটে ট্রেন। বৈশাখ মাস শেষে জ্যৈষ্ঠ আসি আসি। কাল প্রচণ্ড রোদ ছিল। আজ সকালটা মেঘলা মেঘলা। মনে হয় একটু পরে বৃষ্টি হবে।

আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকও এসেছেন। এরই মধ্যে আরো কয়েকজন কর্মী তাদের ঘিরে ধরেছেন।

তাজউদ্দীন আহমদ ভাসানীকে সালাম জানালেন। 'ট্রেন ঠিক সময়ে ছাড়ব তো? খোঁজ নিছ?' ভাসানী বললেন।

তাজউদ্দীন একজন কর্মীকে পাঠালেন স্টেশন-মাস্টারের কাছে।

এই সময় একজন অপরিচিত লোক এসে ভাসানীকে সালাম দিল। বলল, হুজুর, আমার ওপরে অর্ডার হইছে। আপনার মৈশনের মিটিং আমিই রিপোর্ট করব।

মাওলানা বললেন, করো। তোমার কাম তুমি করবা, আমার কাম আমি করব।

লোকটা হাত কচলে কাচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, আমার আপনাদের সাথে যাওয়ার আর ফেরার ব্যবস্থা করে দিয়েন।

মাওলানা বললেন, তুমি মিয়া তোমার পা দিয়া যাইবা, আমরা যামু আমগো পা দিয়া। ব্যবস্থা তো আল্লাহতালাই কইরা রাখছে। তাজুদ্দিন, দেখো, কী ব্যবস্থা করতে পারো। ডিআইবির লোক। আমাগো সাথে যাওনের ডিউটি পড়ছে বেচারার উপরে।

ট্রেন ছাড়ল যথাসময়েই।

মাওলানার এই জনসভাটা তাজউদ্দীনই আয়োজন করেছেন। তাদের এলাকার কাছে হবে জনসভাটা। এলাকার লোকজন এসে ধরেছিল, তারা ভাসানীকে তাদের এলাকায় মিটিঙের জন্য নিয়ে যেতে চায়। তাজউদ্দীনই ভাসানীর কাছে নিয়ে গেছেন তাদেরকে। জনসভার তারিখ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এমনকি লিফলেট লিখে দিয়েছেন। শামসুল হককেও তিনিই বলেছেন। মুজিব ভাই বাইরে থাকলে তাকেও বলতেন জনসভায় যেতে। মুজিব ভাই ভাষণটা খুব ভালো দেন।

ট্রেন ঠিক ৬টা ৫ মিনিটেই ছাড়ল। ভাসানীকে উঠিয়ে দিয়ে, শামসুল হক সাহেবের পেছন পেছন তাজউদ্দীন উঠে পড়লেন ট্রেনে। আর সবাই উঠল। ডিআইবির সদস্যও উঠে পড়লেন। ট্রেন টঙ্গি পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। টঙ্গি স্টেশনে ট্রেন থামল। শামসুল হক বললেন, আমি নেমে যাব।

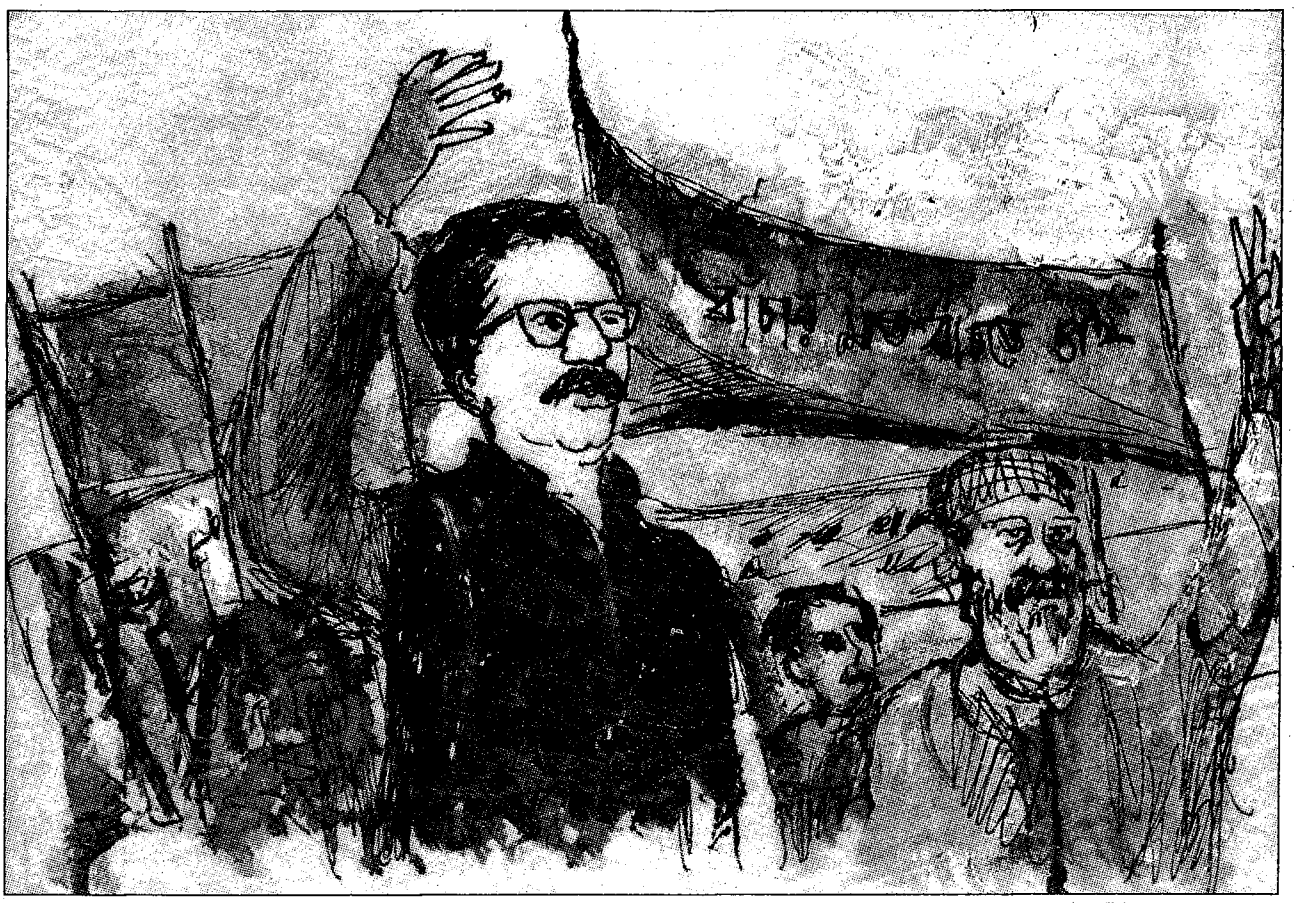

তাজউদ্দীন বললেন, নেমে যাবেন মানে ?

শামসুল হক বললেন, আমি ফিরতি ট্রেনে ঢাকা ফিরে যাব।

কেন ?

দরকার আছে।

কী দরকার।

আছে—বলে তিনি ট্রেন থেকে সত্যি সত্যি নেমে গেলেন।

তাজউদ্দীন বিস্মিত। ইদানীং শামসুল হকের ভাবভঙ্গি একটু ছাড়া-ছাড়া। একটু ধার্মিক হয়ে পড়ছেন। আবুল হাশিম সাহেবও খেলাফতে রাব্বানি নামের দল করার কথা বলছেন। বর্ধমানে বাড়ি পোড়ার পর ভিটেমাটি ছেড়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে মানুষের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া এই একদা বামপন্থি বলে পরিচিত লোকটা এখন রবের খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্যে বইপুস্তক লিখছেন। শামসুল হক আগে থেকেই তার ভক্ত ছিল। সত্য বলতে কী, আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম দিনের ইশতেহারে আবুল হাশিমের এইসব আধ্যাত্মিক লাইনের তত্ত্ব অনেকটাই প্রতিফলিত হয়েছিল।

শামসুল হকের আরেকটা পিছুটান আছে। তাহলো তার স্ত্রী। তিনি ইডেন কলেজের ইংরেজির শিক্ষিকা। আফিয়া খাতুন। আফিয়া খাতুনের বাবা নরসিংদীর সেকান্দর মাস্টার। তারা নবাবপুর রোডে বাসা নিয়েছেন। তাদের একটা মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে।

কামরুদ্দীন সাহেব তাজউদ্দীনকে বলেন, আফিয়া খাতুনকে বিয়ে করায় শামসুল হকের অর্থনৈতিক অসুবিধা কমে গেছে। কিন্তু স্বাধীনতাও সেই সঙ্গে কমছে। কারণ আফিয়া চান তার স্বামী সংসারের দায়িত্ব পালন করুন। তিনি চান শামসুল হক উকিল হোক। টাকাপয়সা আয় করুক। সমাজে পরিচয় দেওয়ার মতো একটা অবস্থানে আসুক। সব রাজনীতিবিদরাই তো আইন ব্যবসায় ভালো, সোহরাওয়ার্দী সাহেব, ফজলুল হক সাহেব, আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন সাহেব—শুধু শামসুল হক কেন কিছু করবেন না! এই পিছুটানে শামসুল হক কিছুটা দিশেহারা। অন্যদিকে দেখো, শেখ মুজিবের স্ত্রী। তিনি কোনোদিনও মুজিবকে পেছনের দিকে টানেন নি। স্বামীর সব কাজেই তিনি হ্যাঁ বলে দিয়ে রেখেছেন।

শ্রীপুর স্টেশনে নামলেন সবাই। তখন কেবল বাজে সাড়ে সাত। ওরা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাংলোয় গিয়ে উঠলেন বৃষ্টিভেজা পথ বেয়ে। লুঙ্গি তুলে ভাসানী হাঁটছেন। তার এইসব কর্দমাক্ত পথে হাঁটার দিব্যি অভ্যাস আছে।

সকাল ১১টা পর্যন্ত তারা ওই ডাকবাংলোতেই অপেক্ষা করলেন। কারণ গাড়ির কোনো ব্যবস্থা আগে থেকে করে রাখা হয় নি। তাজউদ্দীন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন গাড়ির ব্যবস্থা করতে। সাড়ে ১২টার দিকে তিনটা মোষের গাড়ি এল। মওলানা সহ ঢাকা থেকে আগত নেতাকর্মীদের গাড়িতে তুলে দিলেন তাজউদ্দীন। গাড়ি রওনা হলো। আর নিজে চললেন পায়ে হেঁটে।

আড়াইটায় তারা পৌঁছলেন গোসিংগা। সেখান থেকে সাড়ে চারটায় মোষের গাড়ি পৌঁছাল দেওনা কাচারি। এরপর আর গাড়ি যাবে না। মওলানাও নামলেন। প্রায় ৬৫ কি ৭০ বছর বয়স মাওলানার। হাঁটতে লাগলেন সবার আগে। এক ঘণ্টা হেঁটে তারা পৌঁছলেন মৈশনের মিয়াবাড়ি। এখানেই তাদের জন্যে দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিকাল সাড়ে ৪টায় তারা দুপুরের খাবার খেলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শুরু হলো জনসভা। মাইক্রোফোনে আওয়াজ হচ্ছে দারুণ। সকাল দশটার পরে ঝড়বৃষ্টিও থেমে গেছে। আবহাওয়া অতি মনোরম। তাজউদ্দীন মাইকে ঘোষণা দিলেন,

এবার বক্তব্য রাখবেন মজলুম জননেতা সংগ্রামী জননেতা অনলবর্ষী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা ভাসানী...

ভাসানী সারাদিনের ধকলের পর দাঁড়িয়ে মাত্র দেড়টা ঘণ্টা এক টানা ভাষণ দিলেন। মুসলিম লীগের দুঃশাসন যেন পুড়ে

ছাই হয়ে যাবে মাওলানার অগ্নিবচনের উত্তাপে। সমস্ত জনসভা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনল তার বক্তৃতা।

রাত্রি বাস হলো ওখানেই। পরের দিন মিয়াবাড়িতে নাশতা করে সবাই মিলে রওনা দিলেন হেঁটে। সকাল আটটার দিকে। তাজউদ্দীন আহমদের বাড়ি পৌঁছাতে লাগল আড়াই ঘণ্টা।

দই খেয়ে আধঘণ্টা জিরিয়ে নিয়ে মোষের গাড়িতে করে তারা রওনা দিলেন শ্রীপুর স্টেশনের দিকে।

চার কি পাঁচ বছরের হাসু যেন একটা বিশাল খেলাঘর পেয়ে গেছে। ফ্রকের কোনা ধরে আঙুলে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে সে তাকায় গোপালগঞ্জের থানা চত্বরের দিকে। লাল রঙের ইটের দালান, লাল রঙের টিনের ছাদ। এটা ঠিক যেন একটা পুতুলের বাড়ি। বাড়িটা একটু বড়, এই যা! পুতুলগুলোকেও তো তাহলে বড় হতে হবে! কত বড় পুতুল হলে এত বড় ঘরবাড়িগুলোয় মানিয়ে যাবে। মাঠটাও কত বড় আর সবুজ। গাছপালাগুলোও পুতুলের বাড়ির গাছপালা। তাদের টুঙ্গিপাড়ার বাড়ির সামনেও মাঠ আছে, গাছপালা আছে। কিন্তু তাদের বাড়ির গাছগুলোর নিচটা তো এমন সাদা রং করা নয়।

মা বললেন, হাসু, আমরা গোপালগঞ্জ যাচ্ছি। তোমার আব্বার সাথে দেখা করতি।

হাসুর মনের মধ্যে তখন গোপালগঞ্জের একটা কল্পনার ছবি আঁকা হয়ে যায়। এর আগেও সে গোপালগঞ্জ গেছে, সেবারও আব্বাকেই দেখতে, কিন্তু তখন সে ছিল খুব ছোট, তার কিচ্ছু মনে নাই। এবার তার মনে হয়েছিল, টুঙ্গিপাড়ার বাইগার খালের পাড়ে, একটা কঞ্চি হাতে নিয়ে যখন সে ছাগলছানাগুলোর পেছনে ছুটছিল, ছাগলছানার গলায় ঘুঙুর পরানো ছিল বলে ঝুমঝুম আওয়াজ হচ্ছিল, আর সেই আওয়াজ থেকে তার মনটাকে সরিয়ে নিল তার চোখ, একটা ঝলমলে হলদে-কালো প্রজাপতি ওই মধুর গাছের সাদা সাদা ছোটফুলের ওপরে ছটফটে পাখা মেলে ওড়াউড়ি করছে, হাসু তার পিছু নিল, সেখান থেকে তার চোখ পড়ল গিয়ে চোরকাঁটায় ভরা দুর্বা ছাওয়া মাঠটাতে, তার বন্ধু, সমবয়সী রানু বলল, হাসু দেখ দেখ, এইখানে ফড়িংয়ের বাজার বসছে, এই বাজার গোপালগঞ্জ টাউনের বাজারের সমান—তখনই হাসুর মনে পড়ল তারা গোপালগঞ্জ যাচ্ছে, আব্বাকে দেখতে, আর তার মনে হলো, গোপালগঞ্জের সবকিছু পোড়ার মাটির তৈরি, তার বাড়িঘরগুলো পোড়ামাটির, রাস্তাঘাটগুলো পোড়ামাটির, যেমন পোড়ামাটিতে হয় কলসি, হাঁড়িকুড়ি, শানকি, তেমন। এইটা মনে হওয়ার কারণ গোপাল নামের একজন কুমার তাদের বাড়ি বাঁক বয়ে নিয়ে আসত লাল লাল মাটির হাঁড়ি। নৌকায় করে টুঙ্গিপাড়া থেকে আসার পথে, খাল থেকে নদী পড়ার সময়ে শাপলার ফুল ধরে হাসু টান দিয়েছিল, দাদা লুৎফর রহমান আঁতকে উঠেছিলেন, হাসি পইড়ে যাবি তো! মাঝখানে বস। মা হাসুকে টেনে কোলের কাছে নিয়েছিলেন। আর ছোট্ট কামাল, শাপলার সাদা দল দেখে মুগ্ধ, বারবার ওই দিকে আঙুল তুলে বলছে, ফুল দেও, ফুল দেও। দাদি তাকে কোলে ধরে রেখেছেন। চঞ্চল ছেলে আবার পানিতে পড়ে না যায়।

দাদা-দাদি, মা, হাসু—সবাই মিলে তারা চলেছে গোপালগঞ্জে—আব্বাকে দেখতে।

গোপালগঞ্জে তাদের বাসা আছে, আদালতপাড়াতেই, কাজেই তাদের কোনো অসুবিধা হবে না।

আব্বা থানার মধ্যে একটা ঘরে বসে আছেন। বারান্দায় পুলিশ, ভিড় ঠেলে সামলাতে পারছে না। মুজিব ভাই এসেছে, আজকে তার মামলার তারিখে পড়েছে, শুনেই কর্মীর দল আর সাধারণ মানুষ ভিড় করেছে তাঁকে একটা নজর দেখবার জন্যে। মুজিবের বয়স ৩২-এর মতোন হবে। তিনি পড়ে আছেন ফুলহাতা শার্ট আর পায়জামা।

হাসুকে হাতে ধরে আর কামালকে কোলে নিয়ে হাসুর মা রেনু ঢোকেন ওই ঘরে। পুলিশ আর গোপালগঞ্জের আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতারা তাদের এগিয়ে দেন। পেছনে পেছনে মাথায় লম্বা ঘোমটা দিয়ে আসেন হাসুর দাদি। দাদা একটু পিছে পড়েছেন। ছেলে তার ছোটবেলায় খুব সল্টেড বিস্কুট খেতে পছন্দ করত, যখন সে ছিল এই গোপালগঞ্জে, আর পড়েছে মিশন স্কুলে, তখন তাকে অনেকদিন তিনি সল্টেড বিস্কুটের প্লাস্টিকের প্যাকেট কিনে দিয়েছেন। লুৎফর রহমান দুটো বিস্কুটের প্যাকেট কিনে আনেন, ছেলেরা যে বড় হয়ে যায়, বাবা-মা অনেক সময় সেটা বুঝতেও পারেন না।

রেনু বলে, এই যে দেখো তোমার কামাল, কত বড় হয়েছে। কত কথা বলে। নেও কোলে নেও। কামালকে মুজিব কোলে নেন। চুমু দিয়ে গালটা নেড়ে বলেন, কেমন আছো বাবা। এর মধ্যে হাসু কাছে আসে, বলে, আব্বা, এখানে গাছগুলোর নিচে সাদা কেন?

মুজিব তখন হাসুর দিকে তাকান। আরে, আমার মেয়েটা তো অনেক বড় হয়ে গেছে।

আসলেই মুজিব অনেক দিন হাসুকে দেখেন না। প্রায় দুবছর। এর মধ্যে হাসুর বয়স ডাবল হয়ে গেছে।

হাসু বলে, আব্বা, আপনিও বড় হয়ে গেছেন।

রেনু বলেন, আম্মাও এসেছেন। কথা বলো। আম্মা ঘোমটাটা একটু সরান। আপনার ছেলে আপনার মুখ দেখবে না!

মা কাছে আসো। মুজিব ডাকেন মাকে। এগিয়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরেন।

সায়রা খাতুন, মুজিবের মা, ছেলেকে হাতের মধ্যে পেয়ে অশ্রু সংবরণ করতে পারেন না, একবার অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বলতে পারেন, খোকা, ভালো আছিস বাবা?

রেনু কিন্তু কাঁদবেন না। তিনি শক্ত হয়ে থাকবেন। মুজিবের সঙ্গে তার এইটাই চুক্তি। তিনি বলেছেন, তুমি শুধু আমার জন্যে ভাববা না, তুমি সারা দেশের জন্যে ভাববা। মানুষের জন্যে কাজ করবা।

এখন চোখের জল ফেলে মুজিবকে সেই ব্রত থেকে সরাবেন না রেনু। তিনি শক্ত হয়ে থাকেন।

মুজিব বলেন, রেনু কেমন আছ?

ভালো আছি আল্লাহর ইচ্ছায়। তোমার স্বাস্থ্য দেখি খুব খারাপ হয়ে গেছে।

একটা কাশি দিয়ে মুজিব বলেন, আরে না, একটু ঠান্ডা লেগেছে। মুজিব আসলে সত্য গোপন করছেন। তার কাশিটা বেশ মারাত্মক। ব্রংকাইটিসের মতো হয়েছে তার। শুকনো কাশির সঙ্গে রক্তও পড়ছে। এইসব কথা তিনি এখন বলবেন না। রেনু মন খারাপ করবে, মা আরও কাঁদবেন।

ভিড় বাড়ে। হাসু আর কামাল চলে যায় পাশের টিনে ছাওয়া ভবনটার বারান্দায়। কী বড় মাঠ। আর দিঘির জলটা কত শান্ত। দেখলেই শরীরটা ঠান্ডা হয়ে যায়। আরে আশ্চর্য সেই হলুদ কালো প্রজাপতিটা টুঙ্গিপাড়া থেকে কী করে এলো গোপালগঞ্জে।

আর হাসু অবাক হয়ে ভাবে, গোপালগঞ্জটা মোটেও তার কল্পনার মতো নয়। এখানে পোড়ামাটি দিয়ে বানানো ঘরদোর রাস্তাঘাট নাই।

কামাল আর হাসু মিলে প্রজাপতির পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ায়। নীলচে সবুজ কতগুলো কাঁটাগাছ। তার ডগায় হলুদ ফুল। প্রজাপতি একটা নয়, কয়েকটা। তারা ফুলে গায়ে বসছে, কিন্তু ধরতে গেলেই উড়ে যাচ্ছে।

থানার এই ভবনটার পিড়িলি ঘেঁসে পরাটার গাছ। ছোট ছোট পানপাতার মতো পাতা। আর পুতির মতো গোল গোল সবুজ তার ডগার দিকটা। ওই পাতায় চাপ দিলে তেলের মতো বেরয়। তাই বাচ্চারা ওটাকে বলে পরাটার গাছ।

সেই গাছ থেকে হাসু বলে, কামাল চল, রান্নাবাটি খেলি।

তারা রান্নাবাটি খেলার জন্যে নানা ধরনের ফুল পাতা, কলসির কানা, ইটের গুঁড়ো নিয়ে জমা করে বারান্দার লাল মেঝেতে।

পাশের দেয়াল বেয়ে সার বেঁধে যাচ্ছে কালো পিঁপড়ের দল।

আচ্ছা চল, কামাল, আবার আব্বাকে দেখে আসি।

চলো।

ওই সবুজ মাঠের মধ্যে দৌড়ে আবার তারা দুই ভাইবোন ওঠে সেই ঘরের

বারান্দায়, যেখানে আব্বা আছেন।

হাসু বাবার কাছে যায়, আব্বা আব্বা, আমরা রান্নাবাটি খেলি।

কামালও বলে, রান্নাবাটি খেলি।

খেলো মা, যাও—মুজিব সালাম খান সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন। সালাম খানও এই মামলার আসামি। আবার তিনি এডভোকেটও।

হাসু আর কামাল ফের চলে আসে তাদের বিশাল খেলাঘরটার বারান্দায়। যা কামাল তুই নদীতে ডুব দিয়ে আয়, ওই সিঁড়িটা হলো নদী, ওখানে গিয়া বল হাপুস, এই তো একটা ডুব হলো...আমি রান্না করি, এইটা তো ভাত, এইটাতে মাছ, এইটা, এই লাল ইটের টুকরা হলো গোশত....

আরেকটু খেলে হাসু বলে, কামাল, চল, আবার যাই আব্বাকে দেখে আসি।

কামাল বলে, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে একটু আব্বা বলে ডাকি...

হাসু বিস্মিত হয় না। তার এই দুই আড়াই বছরের ভাইটা আব্বাকে তো কমই দেখেছে। আব্বাকে সে বাসায় কোনোদিনও পায় নি। আব্বা সবসময়ই জেলখানায়। আব্বাকে তো আব্বা বলে ডাকার সুযোগই পায় নি।

হাসু বলে, চল চল। উনি কি খালি আমার আব্বা নাকি পাগল। তোরও তো আব্বা।

তারা দৌড়ে যায় মুজিবের কাছে। হাসু বলে, আব্বা, কামাল কী বলে জানো, কামাল বলে, দৌড়ানোর কারণে হাসু হাঁপাচ্ছে—কামাল বলে, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে একটু আব্বা বলে ডাকি।

আব্বা উঠে কামালকে লুফে কোলে তুলে নেন। বলেন, কামাল আব্বা, আমাকে দেখে নাই তুমি, আমি বাড়ি আসি না, আমি তো তোমারও আব্বা....

অনেক চুমু দেন তিনি ছেলেকে।

হাসু গিয়ে বাবার জামার কোনা ধরে। বলছি না আব্বা তোমারও আব্বা, ডাকো আব্বা বলে, বলে, আব্বা, আমরা এখন খেলতে যাই?

কামাল ছোট্ট মুখে লজ্জা ফুটিয়ে বলে, আব্বা আমরা খেলতে যাই...

তখন আকাশে এক খণ্ড সাদা মেঘ সূর্যকে এক লহমার জন্যে ঢেকে দেয় আর একটা ছায়া গোপালগঞ্জ থানার ওপরে একবার পাখা বিস্তার করে পরক্ষণেই রোদের ঝলক বইয়ে দেয়।

মুজিব চশমা খোলেন। রুমাল হাতে নেন। চশমার কাচ ঘোলা হয়ে এসেছে। তিনি কাচ মোছেন।

হাসু আর কামাল আবার সবুজ মাঠের মধ্যে ছুটতে থাকে।

ঢাকা কারাগারের ভেতরে জেল হাসপাতালের বেডে বসে শেখ মুজিব চিঠি লিখছেন। একটা চড়ুই পাখি তার সেলের ভেতরে ঢুকে কিচির-মিচির করল খানিক। শেখ মুজিব পাখিটার দিকে তাকালেন। পাখিটা মনের সুখেই গান গাইছিল বোধ হয়। এবার টের পেল, সে বন্দি। তার বেরুনোর পথ জানা নাই। পাখিটা কোন দিক দিয়ে ঢুকেছিল শেখ মুজিব খেয়াল করেন নাই। জানালায় একটা পর্দা লাগানো। চড়ুইটি কি সেই পর্দা পেরুনোর পথ পাচ্ছে না। শেখ মুজিব উঠে পর্দাটা টেনে ফাঁকা করে দিলেন। এক ঝলক আলো এসে ঢুকল প্রকোষ্ঠের ভেতরে।

চড়ুইটা উড়ে চলে গেল।

মুক্তির আনন্দ!

শেখ মুজিবকে কিছুতেই ছাড়ছে না নুরুল আমীন।

ফরিদপুর কারাগার থেকে তাকে ঢাকা আনা হয়েছে। কারণ তার শরীরটা খুবই খারাপ। কাশি, সর্দি এইসব তো আছেই। তার ওপর তার বুক ব্যথা করে। হৃদপিণ্ডে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না আল্লাহ জানেন।

হৃদযন্ত্রের ব্যাধিতে কি তিনি এই কারাগারেই মরে পড়ে থাকবেন?

মরতে তিনি ভয় পান না। আল্লাহ যেদিন মরণ লিখে রেখেছেন, তার আগে তো আর মৃত্যু আসবে না। কিন্তু তার ভয় হলো, তার কাজগুলো তাকে শেষ করে যেতে হবে। কাজ শেষ না করে তিনি মরতে পারেন না।

পার্টির সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকের স্ত্রী আফিয়া খাতুন তাকে কয়েকটা চিঠি লিখেছেন। তিনি উত্তর দেন নি। শরীরটাই ভালো নয়। তার ওপর এত টানা-হেঁচড়া। একবার ফরিদপুর থেকে গোপালগঞ্জ, গোপালগঞ্জ থেকে ফরিদুপর করলে ৬ দিন শুধু যাতায়াতেই চলে যায়। যাই হোক, অনেক লেখালেখি করে অবশেষে তাকে ফরিদপুর থেকে ঢাকা কারাগারে আনা হয়েছে চিকিৎসার উদ্দেশে। তার চোখের ব্যারাম বেড়েছে। সারাক্ষণ চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

তিনি শামসুল হককে চিঠি লিখতে বসেন :

এস, এম, রহমান
সিকিউরিটি প্রিজনার
সেন্ট্রাল জেল
ঢাকা।

সেন্ট্রাল
ঢাকা
১২/৯/৫১
হক সাহেব,

আমার আদাব নেবেন। ভাবির চিঠি মাঝে মাঝে ফরিদপুরে পাইতাম। সকল সময় উত্তর দিতে পারা যায় না তাহা আপনি বুঝতে পারেন। গোপালগঞ্জের মামলা আজও শেষ হয় নাই। তবে চিকিৎসার জন্য ঢাকা এনেছে। রোগমুক্ত হলেই আবার যেতে হবে। যাহা হউক, ভাবিকে বলেন শীঘ্রই চিঠির উত্তর দিব, তাহাকে ভাবতে নিষেধ করবেন। ভয়ের কোনো কারণ নাই। আমি জানি, আমি মরতে পারি না, বহু কাজ আমার করতে হইবে। খোদা যাহাকে না মারে মানুষ তাহাকে মারতে পারে না।

নানা কারণে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, আমার কোনো কিছুর দরকার নাই যদি ২/১টা খানা ভালো ইতিহাস বই অথবা গল্পের বই পাঠাতে পারেন সুখী হব।

বহুদিন মওলানা সাহেবের কোনো সংবাদ পাই নাই, এখন কেমন আছেন এবং কোথায় আছেন জানালে সুখী হব। আপনার শরীর কিরূপ, বন্ধুবান্ধবদের আমার সালাম দিবেন, কোনোরকম ভয়ের কারণ নাই, তাদের জানাবেন। আমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করব বলে আশা রাখি বাকি খোদা ভরসা। কলেজটা চলছে জেনে সুখী হলাম। মানিক ভাই ও ইয়ার মোহাম্মদের ওপর কলেজের ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে আপনি অন্য কাজ করবেন তাহা হইলে ভালো হবে।

ভাবিকে চিঠি দিতে বলবেন।

ইতি
আপনার মুজিবুর

এনবি : গোপালগঞ্জ মামলার তারিখ ১৯ অক্টোবর। শরীর ভালো হলে পাঠাবে আর ভালো না হলে পাঠাবে না। তবে ঐ তারিখেই সমস্ত সাক্ষী আসবে বলে মনে হয় কারণ তিন মাস পরে তারিখ পড়েছে। কোর্ট সকল কিছুর বন্দোবস্ত না করে আর তারিখ ফেলে নাই। চিঠিটা মানিক ভাইকে দিবেন।

এই চিঠিটা লিখে মুজিব আরেকটা চিঠি লিখতে বসেন তফাজ্জল হোসেন মানিককে।

ঢাকা জেল
ঢাকা
১২-৯-৫১

মানিক ভাই,

আমার সালাম নিবেন। আমার মনে হয় আপনারা সকলে আমার জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। চিন্তার কোনো কারণ নাই। আমি জেল হাসপাতালে ভর্তি আছি।

চিকিৎসার চেষ্টা খুবই হইতেছে। হাসপাতালে কিছুদিন থাকতে হবে বলে মনে হয় কারণ শরীরের অবস্থা এখনও উন্নতির দিকে যায় নাই।

আতাউর রহমান সাহেব দেখা করতে এসেছিলেন। ফেডারেল কোর্ট করা যায় কিনা আর করিবে কি না ? জনাব সুরাওয়ার্দ্দি সাহেব তো পিন্ডি মামলা নিয়া ব্যস্ত। কে মামলা পরিচালনা করিবেন। আপনি সুরাওয়ার্দ্দি সাহেবের কাছে চিঠি লেখে জানুন তিনি করতে পারবেন কিনা আর তা-না হলে অন্য কাহাকে দিয়া মামলা পরিচালনা করার কোনো অর্থ হবে বলে আমার মনে হয় না। আপনারা বাহিরে আছেন, ছালাম সাহেব, আতাউর রহমান সাহেব ও অন্যান্য সকলের সাথে পরামর্শ করে যাহা ভালো বোঝেন তাহাই করিবেন। আমার কিছু বলার নাই।

শুনে সুখী হবেন, সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি কারণ কতদিন বাবার পয়সার সর্বনাশ করা যায়। আর শরীরের অবস্থাও ভালো না কারণ হঠাৎ ঢাকা জেলে আসার পর থুতুর সাথে পর পর তিনদিন রক্ত পড়ে তবে সে রক্ত সর্দি শুকাইয়াও হতে পারে, আবার হাঁচি খুব বেশি হয় বলে অনেক সময় গলা দিয়ে রক্ত পড়তে পারে আর কাশের সাথেও হতে পারে তাই নিজের থেকেই হুঁশিয়ার হওয়া ভালো। কতকাল থাকতে হয় ঠিক তো নাই। এক্সরে করার কথা বলেছি। তবে সরকারের কাছে সকল সময়ই খুব সময় লাগে। কবে এক্সরে করে বলা যায় না। তবে যাহাতে তাড়াতাড়ি হয় তাহার চেষ্টা করিব।

ঢাকা জেলের সুপার সাহেব খুব ভালো ডাক্তার তাই শীঘ্রই ভালো হয়ে যাবো বলে আশা করি। চিন্তার কোনো কারণ নাই। জেলখানায়ও যদি মরতে হয় তবে মিথ্যার কাছে কোনোদিন মাথা নত করব না। আমি একলা জেলে থাকাতে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না। কাজ করে যান খোদা নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। আমার জন্য কিছুই পাঠাবেন না। আমার কোনো কিছুরই দরকার নাই। নূতন চীরে কিছু বই যদি পাওয়া যায় তবে আমাকে পাঠাবেন। চক্ষু পরীক্ষার পর আপনাকে খবর দিব কারণ চশমা কিনতে হইবে। নিজেই দরখাস্ত করে আপনার সাথে দেখা করতে চেষ্টা করব।

আপনার ছোটভাই মুজিব

দুটো চিঠি ভাঁজ করে একই খামে পুরে শামসুল হকের নামে ৯৪ নবাবপুর রোডের আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে জমা দেন মুজিব।

সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ দুটো চিঠিই আটকে রাখে। শেখ মুজিব তা জানতেও পারেন না।

গোপালগঞ্জের সাইদুর রহমান ওরফে চাঁদ মিয়া, বয়স ৩২, কুষ্টিয়া থানার কৃষি অফিসার পড়ে আছেন ঢাকা মেডিকাল কলেজের পোস্ট অপারেটিভ রুমে। অচেতন। তার হাতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। হাতের হাড় ভেঙে গিয়েছিল কুষ্টিয়াতে, বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে জার্মান চিকিৎসক অধ্যাপক নোভাকের চিকিৎসাধীন।

তিনি কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলেন জানেন না। আস্তে আস্তে তার জ্ঞান ফিরতে থাকে, তিনি নানা কিছু স্বপ্নদৃশ্যের মতো দেখতে থাকেন। গোপালগঞ্জের মধুমতি নদী, লঞ্চঘাট, কাদাভরা পথঘাট তার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে থাকে। তারপর তিনি দেখেন, তিনি আকাশে মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন আর একজন আলোয় তৈরি মানুষ তার হাত ধরে তাকে মেঘের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে জ্ঞান পুরোপুরি ফিরে এলে তিনি বোঝেন যে তিনি হাসপাতালে, আর তার হাত কে একজন ধরে আছে।

দৃষ্টি পুরোপুরি পরিষ্কার হয় না, তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে, কে আমার হাত ধরে আছে ?

উত্তর আসে, চানমিয়া, আমি মজিবর।

মজিবর, শেখ মজিবর ?

হ্যাঁ, আমি শেখ মজিবর।

আস্তে আস্তে পুরো ব্যাপারটা সাইদুর রহমান ওরফে চাঁদমিয়ার ধাতস্থ হয়। তিনি কুষ্টিয়া থেকে ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে এসেছেন হাতের হাড়ভাঙার চিকিৎসা নিতে, তার অপারেশন হয়ে গেছে, আর শেখ মুজিবকে আনা হয়েছে পুলিশ প্রহরাধীনে, তিনি কারাগার থেকে এখানে এসেছেন চোখের চিকিৎসা করাতে। পুলিশ সারাক্ষণ তাকে পাহারা দিয়ে রাখে।

শেখ মুজিব শুনতে পেলেন গোপালগঞ্জের চানমিয়া, যিনি কিনা কলকাতায় ভেটেনারি কলেজে পড়ার সময় তার মিছিলে এসে যোগ দিতেন, পাশের ওয়ার্ডেই আছেন আর তার অপারেশন হয়ে গেছে, তিনি তার পাশে এসে বসেছেন।

মুজিব ভাই, আপনি ভালো আছেন ?

কথা বলো না। চুপচাপ থাকো। আমি ভালো আছি।

পুলিশ আসে। মুজিবকে বলে, স্যার, আপনি আপনার ওয়ার্ডে যান। এখানে কতক্ষণ থাকবেন!

মুজিব বলে, চানমিয়া, আমি ওয়ার্ডে যাচ্ছি। তোমার কোনো অসুবিধা হলে বলবা, আমাকে খবর দিবা। শেখ মুজিবকে খবর দাও বললেই সবাই খবর দিবে।

এই মাটি ছাইড়া আমি কোথাও যামু না। কারে বলে দ্যাশ। এই মাটিই আমার দ্যাশ। কুমিল্লার বাড়িতে লাগানো সুপুরি গাছের গোড়ার মাটিতে খুপড়ি চালাতে চালাতে তিনি আপন মনে বিড়বিড় করছিলেন। নিজ হাতে কতগুলো নারকেল আর সুপুরির চারা লাগিয়েছেন কিছুদিন আগে। এগুলো এখনো মাটিতে শেকড় ছড়িয়ে শক্তপোক্ত হয় নি। এই গাছগুলোকে বাঁচাতে পরিচর্যা দরকার। কিন্তু এই যে চারপাশে এত আমজাম কাঁঠাম কদম হিজল গাছ, আকাশের দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে, মাটির গভীরে শেকড় ছড়িয়েছে, এদেরকে যদি জিজ্ঞেস করি, তোমাদের দেশ কি, ও গাছভাইয়েরা, ওরা কী বলবে ? যাবে তোমরা নিজের দেশে ? একটাই দেশ ছিল, এখন ভাগ হয়ে গেছে। এইটা আর তোমাদের দেশ না ? ও বকুল গাছ দিদি, ও অশ্বত্থ দাদা, যাইবা আমগো সাথে, ওইপাড়ে ?

৬১ বছরের বৃদ্ধ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হাসেন। তার সাদা চুল। তার হাসি যেন বকুল, গাছ থেকে নয়, তার মুখ থেকে বকুল ঝরে পড়ে।

এই মাটি ছাইড়া আমি কোথাও যামু না। এই মাটিই আমার দ্যাশ। এই আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাটি, এই আমার কুমিল্লার মাটি। এই আমার পূর্ববাংলার মাটি। রমেশ পানির ঝাঝড়ি এনে তার পাশে দাঁড়ালে তিনি পানি ঢালেন গাছের গোড়ায়, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গাছের পাতাতেও পানি ঢালেন, গাছের পাতারা জলের সোহাগ পেয়ে যেন ঝকমকিয়ে ওঠে, ধীরেন্দ্রনাথ সেই হাসিটুকু যেন দেখতে পান।

রমেশ লোকটা তার পুরাতন ভৃত্য, ঘাড়ে গামছা পরনে ধুতি, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, চামড়া ফাটা, তার বয়স ৪৫ও হতে পারে, ৩৫ও হতে পারে, সে তার বাবুর এই স্বভাব জানে, গাছের সঙ্গে মাটির সঙ্গে কথা কন তিনি।

ধীরেন্দ্রনাথ বলেন, রমেশ, এই যে ছোট সুপারি গাছের চারা, নারকেল গাছের চারা, এইগুলান কলকাতায় তুইলা লইয়া গিয়া মাটিতে লাগাইলে বাঁচব না ?

বাঁচতেও পারে বাবু।

কিন্তু বড়গুলানরে লইয়া যাওন যাইব ? ওই বটগাছটারে যদি তুইলা লইয়া যাই ?

রমেশ হাসে। তার দাঁত কালো, পান তামাক নানা কিছু খেয়ে দাঁতের বারোটা বাজিয়েছে সে।

বড়গাছ কি আর তোলন যাইব বাবু। কাইটা চিইরা তক্তা লইয়া যান।

তাইলে আমরা বড় মানুষগুলান, কই

যামু ? এইহানে থাকুম নাহি কলকাতা যামু ?

রমেশ আবার দাঁত বের করে। বড় কালো ওর দাঁতগুলো।

শোনো, করাচি গেছিলাম না ? মুহম্মদ আলি জিন্নাহর ভাষণটা শুইনা কলজাটা ঠান্ডা হইছে। আসলে তো হেও কংগ্রেসই করত। শিক্ষিত লোক। সেকুলার আছে।

জিন্না কী কইছে ? রমেশ নারকেল গাছের চারার ওপরে পানি ঢালতে ঢালতে শুধায়।

ধীরেন্দ্রনাথের মনে পড়ে জিন্নাহর প্রথম বক্তৃতাটা। করাচিতে গণপরিষদ সম্মেলনে তিনি প্রথম দিয়েছিলেন এই ভাষণটা। 'যাই হোক না কেন, পাকিস্তান কখনোই এমন ধর্মরাষ্ট্রে পরিণত হবে না, যা কিনা ধর্মযাজকরা পারলৌকিক মিশন নিয়ে শাসন করে থাকে। আমাদের আছে অনেক অমুসলিম... হিন্দু, খ্রিস্টান, পারসি, কিন্তু তারা সবাই পাকিস্তানি। তারা অন্যদের মতো সমান অধিকার ভোগ করবে এবং পাকিস্তান বিষয়ে তারা পূর্ণ অধিকার নিয়ে ভূমিকা পালন করবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমরা শুরু করছি এমন একটা কালে, যখন কোনো বৈষম্য নাই, কোনো সম্প্রদায়ের তুলনায় আরেকটা সম্প্রদায়কে আলাদা করা হয় না, বর্ণের কারণে, গোত্রের কারণে কারও প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হয় না। আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এই মৌল নীতি অবলম্বন করে যে আমরা সবাই একটা রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সম-অধিকার সম্পন্ন নাগরিক।'

এই কথা শুনে আসার পরে ধীরেন্দ্রনাথ কি এই কুমিল্লা ছেড়ে, এই পূর্ববাংলা ছেড়ে কলকাতা যেতে পারেন ?

আমি এই মাটির পোলা, আমি এই আমগাছের মতো, এই বটগাছের মতো, আমারে, তোমরা আর কোথাও লইতে পারবা না। আমি এই মাটির সাথে হামাগুড়ি দিয়া মাটি ধইরা আঁকড়াইয়া থাকুম।

রমেশ আবার তার কালো দাঁত বের করে।

মাটির কথাই ধীরেন্দ্রনাথকে বলতে হয়। কংগ্রেসি ছিলেন তিনি। গান্ধীবাদি ছিলেন। জেল খেটেছেন স্বদেশী করতে গিয়ে। স্বদেশ হিসেবে পেয়েছেন পাকিস্তানকে। মাটির গন্ধ তার গা থেকে যায় না। পাস করা উকিল। ওকালতিই তার ব্যবসা। কিন্তু কথা বলতেন মাটির টানমাখা।

মাটি অথবা মা-টি। দুটোই তো মা। ভাষা, সেও তো মা-ই। মায়ের ভাষা... আমরা বলি না ?

তো, ১৯৪৮ সালের বসন্তকালে, ফাল্গুনমাসে, কুমিল্লায় কি ঢাকায় যখন পলাশ ফুটেছে, কোকিল ডাকছে, দখিনা সমীরণ বইছে, তখন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য, তার মাটির কথা, কিংবা মা-টির কথা পেড়ে বসলেন পার্লামেন্টে। জিন্নাহ তখন সভাপতিত্ব করছিলেন গণপরিষদে। পার্লামেন্টে একটা বিধির প্রস্তাব করা হয়েছে। বিধিটা কী ? 'গণপরিষদে সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজির সঙ্গে উর্দুও বিবেচিত হবে।' ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত নোটিশ দিলেন। একটা ছোট্ট, খুবই ছোট্ট সংশোধনী আছে তার। ফ্লোর পেলেন দুদিন পর।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পায়ের নিচে তার করাচির গণপরিষদ ভবনের পাথুরে মেঝে, কিন্তু কোত্থেকে যেন তিনি পাচ্ছেন তার কুমিল্লার মাটির গন্ধ, তার মনে হলো, তিনি বৃক্ষ হয়ে উঠছেন, এবার তার শেকড় তার পায়ের নিচে চাড়া দিচ্ছে, জানান দিচ্ছে তার পায়ের নিচে মাটি আছে, তার রক্তের মধ্যে মা আছে, ভাষা আছে তিনি বললেন, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, স্যার, আমার সংশোধনী: ২৯ নম্বর বিধির ১ নম্বর উপবিধির ২ নম্বর লাইনে 'ইংরেজি/ শব্দের পর অথবা 'বাংলা' শব্দ দুটি যুক্ত করা হোক।'

বাংলার বসন্তকালের সমস্ত শিমুল আর পলাশ আর আম আর জামগাছের মুকুলগন্ধমাখা ডালপালাপাতার ফাঁক থেকে এক কোটি কোকিল কুহু কুহু বলে ডেকে উঠল।

ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি এই সংশোধনীটা ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতার মানসিকতা থেকে উত্থাপন করি নি। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ছ কোটি নব্বই লাখ। এর মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লাখ কথা বলে বাংলায়। তাহলে স্যার দেশের রাষ্ট্রভাষা কোনটি হওয়া বাঞ্ছনীয়।....স্যার এই জন্যে আমি সারাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর মনোভাবের পক্ষে সোচ্চার হয়েছি। বাংলাকে একটা প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে গণ্য করা যাবে না। এই বাংলাভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।'

পূর্ববঙ্গের সাধারণ সদস্য প্রেমহরি বর্মণ তাকে সমর্থন করলেন।

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান উঠে দাঁড়ালেন। তার বক্তব্য হলো, এটা আসলে কোনো নিরীহ সংশোধনী নয়, এটা হলো পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে যে ইস্পাত কঠিন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা বিনষ্ট করা। পাকিস্তান একটা মুসলিম রাষ্ট্র। এ জন্যে মুসলিম জাতির ভাষা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।

উঠে দাঁড়ালেন ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত। তিনিও পূর্ববঙ্গের সদস্য। বললেন, প্রধানমন্ত্রী এমন কিছু মন্তব্য বেছে বেছে করেছেন, যা তিনি না করলেও পারতেন।

পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বললেন, আমি নিশ্চিত, পাকিস্তানের বিপুল জনগোষ্ঠী উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে।

পূর্ববঙ্গের শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বললেন, পাকিস্তান একটা মুসলিম রাষ্ট্র, এই কথাটা পরিষদের নেতার মুখে শুনে দুঃখ পেয়েছি খুব। এতদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল, পাকিস্তান গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্রে মুসলিম আর অমুসলিমদের সমান অধিকার।

ভোটে উঠল সংশোধনীটা। পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি কণ্ঠভোটে দিলেন প্রস্তাবটা। মোট সদস্য ৭৯জন। ৪৪ জন পূর্ব বাংলার।

কিন্তু কণ্ঠভোটে ধীরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল।

এক কোটি কোকিল তীব্রস্বরে ডেকে উঠল পূর্ববাংলায়। এক লক্ষ শিমুল মাথা ঝাঁকাল। এক লক্ষ পলাশ পাপড়িতে আগুন জ্বালাল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল আর পুরনো ঢাকার নানা স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে পড়তে লাগল স্লোগান দিতে দিতে পাখির ঠোঁটে ঠোঁটে বার্তা রটে গেল, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। সেই ১৯৪৮-এর ফাল্গুনেই। ১১ মার্চ হরতাল। পিকেটিং করতে হবে। ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। ছাত্রনেতা শেখ মুজিবের জলদগম্ভীর কণ্ঠ বেজে উঠলে অলি আহাদ সমর্থন দিলেন। তোয়াহা, শওকত, শামসুল হক, অধ্যাপক আবুল কাশেম, নাইমুদ্দিন, আবদুর রহমান চৌধুরী, কামরুদ্দীন, তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল হরতালের দিনে কে কোন জায়গায় পিকেটিং করবেন, দায়িত্ব ভাগাভাগি হয়ে গেল।

মাটির টানটা ধীরেন্দ্রনাথের কথায় বার্তায় ছিল সর্বক্ষণই। '৪৮ সালেই ময়মনসিংহ শহরে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে আগের বক্তা মালেক সাহেবের 'দেশে আরেকটা তুলাধুনার ব্যবস্থা হওয়া উচিত' এই বক্তব্যের পরে তিনি বললেন, 'এই তো মাত্র দেশে বহুত তুলাধুনা হইয়া গেল, কিন্তু তার রেশ তো এখনো শেষ হইল না। কাজেই এমন ব্যবস্থা করতে হইব, যাতে হিন্দু-মুসলমান, আমরা বরাবর যে রকম মিইলা মিইশা কাজ কইরা যাইতাছি, ইংরেজের বিরুদ্ধে মিইলা মিইশা সংগ্রাম কইরা তারারে তাড়াইছি, এইভাবে মিইলা মিইশাই আমরা আগাইয়া যাইব, এই সম্প্রীতি কিছুতেই নষ্ট হইতে দেওন যাইব না।'

কথায় মাটির গন্ধ। মগজে মাটির নেশা। কতজন উকিল কুমিল্লা ছেড়ে চলে গেল কলকাতায়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গেলেন না। মন্ত্রী হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভায়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। তো মন্ত্রী তো তিনি কলকাতাতেও হতে পারতেন। হয়তো মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন, ডেপুটি লিডার ছিলেন কংগ্রেসের। মুখ্যমন্ত্রী না হলেও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তো হতে পারতেনই।

কিন্তু কুমিল্লার মাটি, মেঘনা কি তিতাসের জল তাকে আবিষ্ট করে রাখল। এই মাটিই যে তার দেশ।

'৭০-এ তাকে ছেলেরা, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা বলল, কলকাতায় চলে এসো। মেয়ে পুতুল বলল, বাবা দেশে যদি একটা কিছু ঘটে যায়, তোমাকেই তো বাবা সবার আগে মারবে। তিনি বললেন, তোরা শুনবি তোর বাবাকে গুলি করে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে। শকুনি আমার দেহটা খাচ্ছে। তবু তো ভালো প্রাণীর খাদ্য হব। জীবন এইভাবে করলে একটা মূল্য থাকে।

সেই কথা শুনে রমেশ কেঁদে উঠেছিল। পুতুল বলেছিল, কাকু, কেঁদো না তো। বাবাকে তো চেনোই। সেই স্বদেশী আমল থেকে জেলখাটা মানুষ।

রমেশ বলল, কোথাও সইরা থাকলেই তো হয়।

এই মাটি ছাইড়া আমি কই যামু রমেশ ? ৮৫ বছরের বৃদ্ধ অকম্পিত স্বরে বললেন।

১৯৭১ সাল। ২৯ মার্চ। কুমিল্লা শহরে কারফিউ। চারদিকে নিস্তব্ধতা। শিমুল ফুল ফেটে গিয়ে তুলো বীজ উড়ছে, তার শব্দও যেন পাওয়া যাবে, এমনি নিস্তব্ধতা। থেকে থেকে ফৌজি গাড়ি ছুটছে আর তার পেছনে ধেয়ে যাচ্ছে নেড়ি কুকুরের দল।

ধীরেন্দ্রনাথকে আজ বড় শান্ত দেখায়। তিনি সন্ধ্যার সময় মাথা ধুলেন। নাতনিকে ডেকে এনে বললেন, ওই কালো চামড়ার মোড়া বইটা দাও তো দিদি। বইটা এনে দিল নাতনি। তিনি পাতা উল্টালেন। লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিলেন কয়েকটা বাক্যে। বললেন, শোনো, কী লেখা এখানে, দেশের জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলে সে মরে না, সে শহীদ হয়। সে অবিনশ্বর তার আত্মা অমর।

পুত্র আর পুত্রবধূদের ডাকলেন তিনি। বললেন, 'আজ রাতেই ওরা আমাকে নিয়ে যাবে।' রমেশের চোখ দিয়ে দরদরিয়ে জল গড়াতে লাগল। সুপুরিগাছগুলো বড় হয়েছে। নারকেলগাছে নারকেল ধরেছে।

রাত বাড়ছে। কুকুরের আর্তনাদ আসছে কানে। রাত দেড়টায় বাড়ির সামনে এসে থামল পাকিস্তানি সৈন্যদের ট্রাক। ধরে নিয়ে গেল ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আর তার ছোট ছেলে দীলিপ দত্তকে।

ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হলো তাদেরকে। ওটা ততক্ষণে কসাইখানায় পরিণত হয়েছে। বাঙালি সৈন্য ও অফিসারদের মারা হয়েছে নৃশংসভাবে।

নির্যাতন শুরু হলো ৮৫ বছরের ওই বৃদ্ধের ওপরে। এই বৃদ্ধই সব নষ্টের গোড়া। আজ থেকে ২৪ বছর আগে করাচির পার্লামেন্টে এই মালাউনই প্রথম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তোলে। এই বছর ফেব্রুয়ারিতেও শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে বেঙ্গমান শেখ মুজিব এই ধীরেন্দ্রনাথের নাম নিয়েছে। ওকে পেটাও।

বেশি প্রহার দরকার ছিল না। হাঁটুর হাড় মড়মড় করে ভেঙে গেল। তবুও থামে না নির্যাতন। চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো কলম। যেন এই চোখে সে আর কোনোদিনও বাংলা বর্ণমালা দেখতে না পায়। দু'হাতের নখ উপড়ে ফেলা হলো। চোখের পাতা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হলে।

ক্যান্টনমেন্টের একজন নাপিত দেখতে পেল, বুড়ো মানুষটি হামাগুড়ি দিচ্ছেন, একটু আড়ালে সরে যাচ্ছেন মলত্যাগ করবেন বলে। একাত্তরের বসন্তে, চৈত্রের শেষদিনে নাকি পহেলা বৈশাখে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে পাকা শান ছেড়ে চলে এলেন মাটিতে। মাটি আঁচড়ালেন। মাটি মাখলেন চোখেমুখে মাথায়।

নাপিতটা ভাবল, মলত্যাগ করতেই এসেছেন। কিন্তু এবার তিনি মলত্যাগ করতে আসেন নি। তিনি বিড়বিড় করলেন। বললেন, এই মাটিই আমার মা। এই মাটিই আমার দেশ। এই মাটি আমার মা-টি। তার ভাষাই আমার মায়ের ভাষা। মাটি, আমি তোমাকে নিলাম। মা-টি, তুমি আমাকে নাও।

তিনি মাটিতে দেহ রাখলেন।

পাকিস্তানি সৈন্যরা আরও আরও বাঙালি সৈন্য আর বেসামরিক মানুষের সঙ্গে তাকে পুঁতে ফেলল মাটিতেই।

রমেশ আর্তনাদ করে। কোনো রকমে কুমিল্লা ছেড়ে আগরতলা পাড়ি দিয়ে রমেশ নিজের প্রাণটা বাঁচিয়েছিল। তারও বয়স হয়েছে। চোখে ঠিকমতো দেখতে পায় না। দাঁত পড়ে গেছে। কিন্তু সে তো বেঁচে আছে। আর ফিরে এসেছে কুমিল্লায়। তার মনিব ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়েছিল, সেই কথাটা কুমিল্লার আকাশে-বাতাসে ১৯৭২-এ খুব শোনা গেল। রমেশও শুনল। কতজনের মুখ থেকে!

তারা বলল, উনি হামাগুড়ি দিতেন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে, আড়াল খোঁজার জন্যে।

রমেশ বিড়বিড় করে বলল, আমি জানি ক্যান বাবু হামাগুড়ি দিছল। মাটি ধরার জন্যে। ভগবান তার ইচ্ছা পূরণ কইরাছে, তিনি মাটিতেই মিইশা গেছেন। ■

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com